মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীদের পত্রিকা

নবীন

ষোড়শ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০১৮

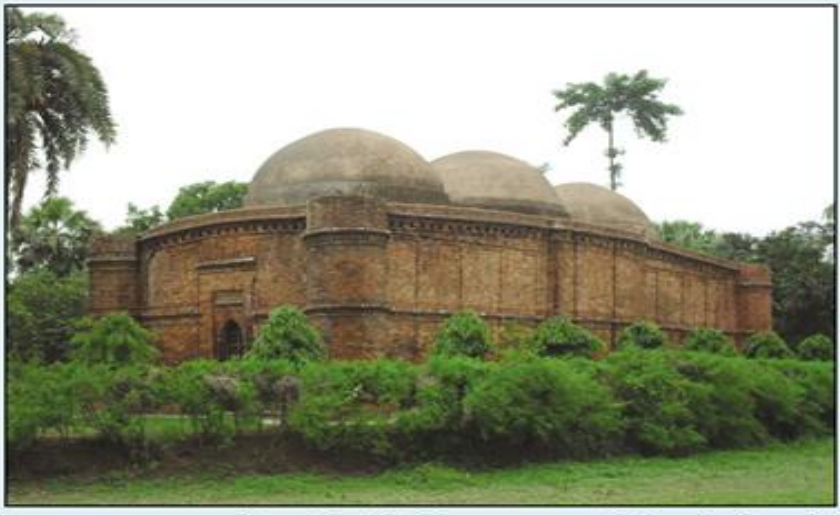

খেরুয়া মসজিদ । বগুড়া জেলার শেরপুরে অবস্থিত । মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায়, মসজিদটি ৯৮৯ হিজরি/১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে জওহর আলী খান কাকশালের পুত্র নবাব মির্জা মুরাদ খান নির্মাণ করেছিলেন । আয়তাকার মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ১৭.৩৪ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থে ৭.৫ মিটার । চারদিকের দেয়াল প্রায় ১.৮৩ মিটার পুরু । মসজিদের চারকোণে রয়েছে চারটি অষ্টভুজ মিনার । একটি একক আইলের ওপর তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ এটি । গম্বুজ তিনটি উপুর করা নকশাবিহীন তিনটি সমান বাটির মতো । সুলতানী আমলের গম্বুজের নির্মাণশৈলীর সঙ্গে এই মসজিদের গম্বুজের স্টাইলের মিল রয়েছে । খেরুয়া মসজিদে কিছু পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণও ছিল । এখন তা চোখে পড়ে না ।

তেঁতুলিয়া শাহী জামে মসজিদ । সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার তেঁতুলিয়া গ্রামে রয়েছে প্রায় দেড় শত বছরের পুরাতন এই মসজিদ । ভিন্ন ভিন্ন নামে রয়েছে এর পরিচিতি । মিয়ার মসজিদ নামে ডাকেন স্থানীয়রা । মূল নাম খান বাহাদুর কাজী সালামতউল্লাহ জামে মসজিদ হলেও বর্তমান পরিচিতি তেঁতুলিয়া শাহী জামে মসজিদ নামেই । ১৮ শতকে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন জমিদার কাজী সালামতউল্লাহ । মসজিদটিতে ৭টি দরজা রয়েছে । প্রতিটি দরজার উচ্চতা ৯ ফুট এবং প্রস্থ ৪ ফুট । ১০ বর্গফুট বেড় বিশিষ্ট ১২টি পিলারের উপর মসজিদের ছাদ নির্মিত । চনসুরকি ও চিটাগুড়ের গাঁধুনিতে নির্মিত মসজিদটিতে ১৫ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট ৬টি বড় গম্বুজ ও ৮ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট ১৪টি মিনার রয়েছে । ২৫ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট চারকোনে ৪টি মিনার । মসজিদের ভিতরে ৫টি সারিতে ৩২৫ জন ও মসজিদের বাইরের চত্বরে ১৭৫ জন নামাজি একসাথে নামাজ আদায় করতে পারেন ।

নবীন

ষোড়শ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০১৮

সূচিপত্র

পহেলা বৈশাখ : ঐতিহ্যের বর্ষবরণ ২
মেট্রোরেল : দেশের প্রথম বৈদ্যুতিক রেল ৪
স্বপ্ন হলো সত্যি মহাকাশে বাংলাদেশ ৬
অংকুর ৮
সুফিয়া কামাল নারীমুক্তির জননী সাহসিকা ১০
একটি পরিবেশ দূষণমুক্ত পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা ১২
মানুষ মানুষের জন্য ১৩
ট্যাকটিকস অব টেসলা কোড ১৪
দেশীয় ফলে মাতাব দেশ-বিদেশ ১৫
আমে ফরমালিন? চেনার উপায় ১৭
বয়ঃসন্ধিতে কি করবে কিশোর কিশোরীরা? ১৮
কৃষি অর্থনীতি পড়ে যে সব চাকরি ২০
সুন্দর করে কথা বলা শিখতে চাও
১০টি উপায়ে জেনে নাও ২১
ইংরেজিতে দারুণ কাজে দেবে লেখার অনুশীলন ২৩
ফাউন্ডেশন সংবাদ ২৪
প্রকল্প সংবাদ ২৫
মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা
বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে ২৯
মাথায় কত প্রশ্ন আসে ৩১

সম্পাদক : তাসনিম হাসান হাই সহকারী সম্পাদক : মো. শাহরিয়ার পারভেজ

প্রকাশক : হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড, প্লট নং ২৩/৬, ব্লক-বি, বীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন : ৯১২১১৯০, ৯১২১১৯১, ০১৭২৭২০৯০৯৮। ই-মেইল : hdf.dhaka@gmail.com

পহেলা বৈশাখ : ঐতিহ্যের বর্ষবরণ

সময়ের পরিক্রমায় বিষয়গুলো কত সহজ হয়ে যাচ্ছে! এখন অল্পক্ষনেই কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে মানুষ তার কাজ এগিয়ে নিচ্ছে। কয়েক দশক আগেও তো আমরা এমন ভাবতে পারিনি। যদিও সব ক্ষেত্রে এই কম্পিউটার ব্যবহারের প্রচলন যে ঘটেছে তা বলা যাবে না। এখনো অনেক ক্ষেত্রে রেজিষ্টার খাতার মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা তাদের হিসাব কষে থাকেন।

ব্যবসাক্ষেত্রে হিসাব রাখার যে রীতি সেটা এক সময় করত হালখাতা। বছর শেষে ব্যবসায়ীরা নিজেদের দেনা-পাওনার হিসাবনিকাশ তাদের ক্রেতাদের কাছে প্রদান করেন বা বুঝে নেন, এই প্রক্রিয়া যে উৎসবের মাধ্যমে পালন করা হয়, তাই যুগে যুগে হালখাতা অনুষ্ঠান নামে পরিচিত হয়ে আসছে। আজও তার গ্রহণযোগ্যতা এতটুকু কমেনি। বরং সময়ের সাথে সাথে আজ সেটা পরিণত হয়েছে বাঙালির উৎসবে। বাংলা নতুন বছরের উৎসব, বাঙালির প্রাণের উৎসব, পহেলা বৈশাখ।

শুরুর দিনগুলো আজকের মতো উৎসবের ছিল না। সময়ের প্রয়োজনে এই উপলক্ষের আগমন। ইতিহাসের পাতা থেকে যেটি জানা যায়, হিন্দু সৌরপঞ্জিকা অনুসারে বাংলা বারো মাস অনেককাল আগে থেকেই পালিত হতো। যে সময় প্রযুক্তির সুবিধা না পাওয়ায় কৃষকদের কৃষিকাজের হিসাবাদি ঋতুর উপরই নির্ভরশীল ছিল।

মুঘল সম্রাটেরা তাদের কৃষিপণ্যের খাজনা আদায় করত হিজরি সন অনুসারে। হিজরি সন চাঁদের উপর নির্ভরশীল, ঋতুর সাথে নয়। যে কারণে খাজনা প্রদান কৃষকদের জন্য পরিণত হতো শোষণে। পরিবর্তনটা আনলেন সম্রাট আকবর। কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা, মাশুল, শুল্ক আদায় করতেন চৈত্র মাসের শেষ দিনে। আর পরের দিনটি থাকত পহেলা বৈশাখ। এই দিনটিতে ভূমি মালিকেরা তাদের অঞ্চলের মানুষদেরকে আপ্যায়ন করতেন বিভিন্ন মিষ্টান্ন দ্বারা, খোলা হতো হিসাব মেলানোর হালখাতা। এভাবেই শুরু নববর্ষের আগমনী অনুষ্ঠান, যা বিভিন্ন সামাজিক পরিবর্তন, পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে আজকের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান।

পহেলা বৈশাখ হচ্ছে লোকজের সাথে নাগরিক জীবনের একটি সেতুবন্ধন। ব্যস্ত নগর কিংবা গ্রামীণ জীবন যেটাই বলা হোক না কেন, এই নববর্ষই বাঙালী জাতিকে একত্রিত করে

জাতীয়তাবোধে। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, ত্রিপুরাসহ দেশে বিদেশে বসবাসরত প্রতিটি বাঙালি এই দিন নিজ সংস্কৃতিতে নিজেকে খুঁজে পায়। পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান পরিণত হয় প্রতিটি বাঙালির কাছে শিকড়ের মিলন মেলায়। ধর্ম, বর্ণ সকল পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে বাঙালি জাতি এই নববর্ষকে সাদরে আমন্ত্রণ জানায়। গ্রামীণ মেলাগুলো পরিণত হয় উৎসবে। এই উৎসবের রংই একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গড়তে বাঙালি জাতিকে এগিয়ে নিয়েছে বারবার।

নতুন বছরকে বরণ করে নেয়ার জন্য এদেশের মানুষ সবসময়ই আন্তরিক, অকৃত্রিম ও অগ্রগামী। দীর্ঘ প্রস্তুতির বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে অনেক আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সব পেশার মানুষ। বৈশাখী মেলা হালখাতা অনুষ্ঠান কিংবা নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয় এই নতুন বছরকে আমন্ত্রণ জানাতে। বাংলার পটশিল্পীরা তাদের পসরা সাজিয়ে বসে। পটশিল্পে জায়গা করে নেয় আমাদের গ্রামীণ জীবনের নানা কথা। লোকজ ব্যবহারিক তৈজসপত্রের বিভিন্ন অংকন শিল্প আমরা খুঁজে পাই এই পটচিত্রের মাধ্যমে। শিল্পী তার রঙিন আলপনায় স্বপ্ন দেখে আগামী দিনের। নিজ সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠে বাঙালি জাতির প্রজন্ম।

নগরকেন্দ্রিক ব্যস্ততাকে পিছে ফেলে সমস্তশ্রেণি পেশার মানুষ এই দিনটিকে সাদরে বরণ করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বহু সাংস্কৃতিক সংগঠন মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করে। ১৯৮৯ সালে শুরু হওয়া এই শোভাযাত্রা সকল অপসংস্কৃতি, অনিয়মের বিরুদ্ধে এক জোরালো প্রতিবাদ। জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো ২০১৬ সালে এই মঙ্গল শোভাযাত্রাকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। বাঙালি সংস্কৃতির জন্য যা ছিল একটি বিশাল অর্জন। এছাড়া রমনার বটমূলসহ দেশের প্রতিটি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় সংগীত, নৃত্যকলা কিংবা আবৃত্তি। এই শিল্পগুলোর প্রতিটিই স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের শিকড়কে। বরণ করে নেয় নিজ পরিচয়ের নববর্ষকে।

নববর্ষের এই উৎসব নারী পুরুষ সকলের। উৎসবে যোগ দেয়ার স্বাধীনতাও সবার সমান। কিন্তু দুঃখজনকভাবে নারী হয়রানি এবং নির্যাতনের বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যাচ্ছে উদ্‌যাপনকালে, উৎসবস্থলে। এটি আমরা মেনে নেব না। এবারের নববর্ষের শুভক্ষণে মুছে যাক বিগত বছরের জরা এবং গ্লানি, যার মধ্যে সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলো। সকলের প্রতি আহবান, যার যার অবস্থান থেকে, বছরের প্রথম দিনটি থেকেই সকল প্রকার নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করি, প্রতিরোধ গড়ি, প্রতিকার করি।

একটি জাতি যখন তার নিজ সংস্কৃতিতে বলিষ্ট হয় তখন তাকে কোনো অপসংস্কৃতি, কু-সংস্কার গ্রাস করতে পারে না। তাই নিজ সংস্কৃতির সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসা শিল্পগুলোর নিয়মিত চর্চার প্রয়োজন। যে কোন জাতির কাছেই তার নিজ সংস্কৃতিই সেরা এবং আপন। বিশ্বায়নের এই যুগে নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষায় এবং বিস্তারে আমাদের নিজেদের সংস্কৃতির ছায়াতলে অবস্থান নিতে হবে। অন্যান্য সংস্কৃতির সাথেও আমরা পরিচিত হব, তবে তার আড়ালে যেন ঢেকে না যায় আমাদের যা স্বকীয়তা। বাঙালি হিসেবে নিজ সংস্কৃতির প্রতি আমাদের আছে দায়বদ্ধতা। পহেলা বৈশাখের গুরুত্ব আমাদের প্রতিনিয়ত আলোর পথ দেখাতে সাহায্য করে। আমাদের সংস্কৃতিই হোক আমাদের শেষ আশ্রয়।

মো. ইমদাদুল খান
১১ এপ্রিল ২০১৮ blog.brac.net

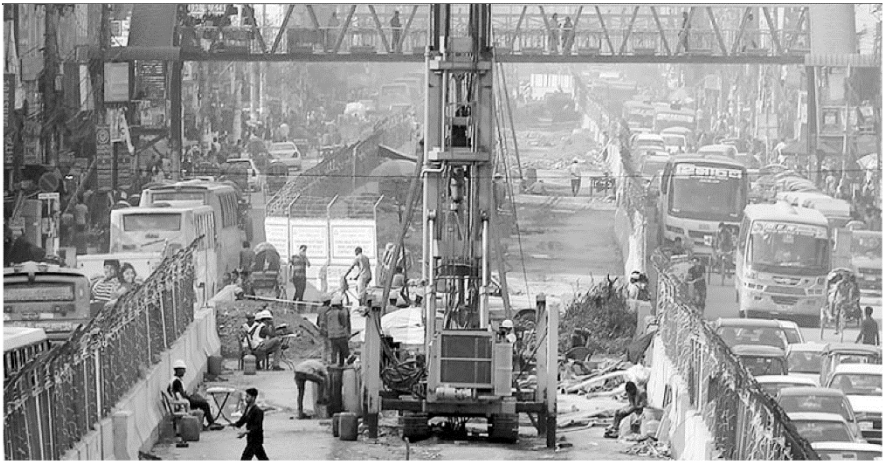

মেট্রোরেল : দেশের প্রথম বৈদ্যুতিক রেল

যানজটের নগরীতে আশাজাগানিয়া মেট্রোরেল

যানজটের নগরী ঢাকা। সম্প্রতি দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা দক্ষিণ এশিয়ার অনুন্নত দেশের তালিকায় দ্বিতীয় হয়েছে। আর এমন অবস্থায় ঢাকার উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পথ মাত্র ৩৭ মিনিটে পাড়ি দেয়া এ যেন এক অবাস্তব স্বপ্ন। মেট্রোরেল চালু হলে এই অবাস্তব স্বপ্নই বাস্তবে রূপ নেবে। তাও আবার এক বছরের মধ্যে!

প্রকল্প ঘুরে এমন তথ্যের সত্যতা মিলল। প্রকৌশলীদের ভাষায়, এমআরটি (ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট) লাইন-৬-এর একাংশ। সহজভাবে বললে, উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রোরেলের কাজ এখন জোরেশোরে চলছে। এই অংশটিই ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হবে। ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের আওতাভুক্ত এ মেট্রোরেল কাজের তৎপরতা মিরপুর আর উত্তরাবাসী টের পাচ্ছে কয়েক বছর হলোই। এখন বড় বড় যান আর যন্ত্রাংশের উপস্থিতিই বলছে স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেতে আর বেশি সময় লাগবে না। আগারগাঁও থেকে মিরপুর পর্যন্ত মেট্রোরেল প্রকল্পের দৃশ্যমান কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। রোকেয়া সরণির পরিকল্পনা কমিশনের কাছ থেকে মিরপুর পর্যন্ত সড়কের মাঝ বরাবর ব্যারিকেড দিয়ে এমআরটি প্রকল্পের কাজ চলছে দিনে-রাতে। সেতু বিভাগ সূত্র বলছে, এরই মধ্যে এ প্রকল্পের কাজে সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ। আর কাজীপাড়ার বসিন্দা শামিম মিয়া (৫২) জানান, প্রথম দিকে অসহ্য মনে হলেও এখন একটু শান্তি লাগে এই দেখে যে, কাজ হচ্ছে। শেষ হলে যানজট কমবে। আবার বেনারসি পল্লীর ব্যবসায়ী সোহরাব আলী (৬২) জানান, হয়তো শেষ বয়সে মেট্রোরেলে ওঠা যাবে। কাজের ভোগান্তি নিয়ে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা মিরপুরের মানুষের ভাবনায় এখন, কত দ্রুত সময়ে শেষ হয় এই কাজ।

আগারগাঁওয়ে গিয়ে দেখা গেছে, পরিসংখ্যান ভবনের সামনের রাস্তা ঘিরে ফেলে চলছে কর্মযজ্ঞ। সেখানে এরই মধ্যে টেস্ট পাইলের কাজ শেষ হয়েছে। চলছে টেস্ট মূল পাইলিংয়ের কাজ। প্রকৌশলীরা জানান, এখানে কন্ট্রোল রুম, সাইট অফিস, বেসিন প্ল্যান্ট বসানোর কাজ চলছে। উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ৯ স্থানে টেস্ট পাইলের কাজ শেষ। এগুলোর মধ্যে ৪টি করে অ্যাংকর এবং একটি করে পাঁচটি পাইলট পাইল হবে।

উত্তরায় গিয়ে দেখা যায়, বিশাল নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে ২২ হেক্টর জমিতে চলছে ডিপো নির্মাণের কর্মযজ্ঞ। এখানে সয়েল ইম্প্রুভমেন্ট বা মাটি উন্নয়ন কাজ শেষ। চলছে ডিপো স্থাপনের

কাজ। মাটির ২০-২২ মিটার গভীর পর্যন্ত জাপানি প্রযুক্তির সাহায্যে সিলেটের বালু দিয়ে কম্পাকশন বা চাপ দিয়ে সংকোচন করা হয়েছে। যদিও উত্তরা অংশের মানুষ এখনো হয়তো বুঝতেই পারছে না, কীভাবে এই কাজ এগিয়ে চলছে। যদিও ওই অংশেই কাজের গতি বেশি। কারণ হিসেবে প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমএএন সিদ্দীক জানান, ওই এলাকায় কাজ শুরু হয়েছে এবং ভারী যন্ত্র ও যানের চলাচলে খুব বাধা পেতে হচ্ছে না। তাই এই অংশে কাজ এগিয়ে চলছে দ্রুত এবং আগামীতে যখন মিরপুর বা ফার্মগেট বা মতিঝিলের মতো ব্যস্ত এলাকায় কাজ শুরু হবে, তখনো কাজের গতি একই রাখার পরিকল্পনা করা আছে।

২০১২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয় সরকার আর শেষ হলে প্রথম ধাপে উত্তরা তৃতীয় প্রকল্প থেকে মতিঝিল বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত এ প্রকল্পের মাটি পরীক্ষার কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা-জাইকা দেবে ১৬ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকা। আর সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন হচ্ছে ৫ হাজার ৩৯০ কোটি টাকা। প্রায় ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ মেট্রোরেল প্রকল্পে থাকবে ১৬টি স্টেশন। সে নকশাও চূড়ান্ত। প্রায় ১৮০ মিটার লম্বা হবে প্রতিটি স্টেশন। এসব স্টেশন নির্মাণ করা হবে প্রায় দোতলা সমান উচ্চতায়। নিচতলায় হবে টিকিট ক্রয় ও স্বয়ংক্রিয় প্রবেশ পথ। স্টেশনের দুই পাশ থেকে যাত্রীরা আসা-যাওয়া করতে পারবে। মেট্রোরেলের ১৬টি স্টেশন হবে যথাক্রম উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ, পল্লবী, মিরপুর-১১, মিরপুর-১০, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, আগারগাঁও, বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ও মতিঝিল। সূত্র জানায়, মেট্রোরেলে মোট ২৮ জোড়া ট্রেন থাকবে। প্রতি ট্রেনে থাকবে ছয়টি করে কোচ বা বগি। আর প্রতি চার মিনিট পরপর ১৮০০ যাত্রী নিয়ে চলবে মেট্রোরেল। ঘণ্টায় প্রায় ৬০ হাজার যাত্রী চলাচল করবে এ পরিবহনে। এ ট্রেনের গতি হবে ঘণ্টায় গড়ে ৩২ কিলোমিটার। সর্বোচ্চ ১শ' কিলোমিটার। প্রতি ৪ মিনিট পর ট্রেন ছেড়ে যাবে।

আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৭টি মেট্রোরেল স্টেশন : বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ও মতিঝিল।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উত্তরা থেকে মতিঝিল মাত্র ৩৭ মিনিটে যাওয়া যাবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মেট্রোরেল তৈরির মধ্য দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্বমানে উন্নীত হওয়ায় ঢাকার যানজটও কমে যাবে।

মিরপুর সাড়ে ১১ নম্বরে গিয়ে দেখা যায়, রাস্তার মিডিয়ান বরাবর ফেন্সিং করা হয়েছে। এখানে কাজ করছেন শ্রমিক ও প্রকৌশলীরা। তারা জানান, টেস্ট পাইলিং ও লোড টেস্টের কাজ প্রায় শেষ। এ স্থানে সার্ভিস পাইলের বা মূল পাইলিং কাজ শুরু হয়েছে। কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দিন-রাত সমানতালেই কাজ চলছে। বিভিন্ন শিফটে ভাগ করে কাজ করা হচ্ছে। যদিও মূল চ্যালেঞ্জ এখন কাজ চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি যানজট ব্যবস্থাপনা। যতই কাজ ব্যস্ত এলাকার দিকে এগিয়ে যাবে ততই যানজট বাড়বে। আর সড়ক সরু হওয়ার কারণে ভারী যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। যদিও প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলছেন, সড়ক প্রশস্ত করে ট্রাফিক ও কমিউনিটি পুলিশের মাধ্যমে যানজট ব্যবস্থাপনা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া রোকেয়া সরণিতে রিকশা-ভ্যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। যেন সব যান একই গতিতে চলাচল করতে পারে। পাশাপাশি বাসস্ট্যান্ডগুলোতেও বাস দীর্ঘক্ষণ যেন দাঁড়িয়ে না থাকে, সেই ব্যবস্থাও করা হবে।

মেট্রোরেল চালু হলে নগরবাসী যে সুবিধা পাবে, তা নিয়ে দ্বিমত নেই বিশেষজ্ঞদের। তবে সংসদ ভবন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর দিয়ে এই রেল লাইন করার বিরোধিতা করেন অনেকেই। এছাড়া এই রেল থেকে তৈরি হওয়া কম্পন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনার জন্য সমস্যার সৃষ্টি করবে বলেও মত দেন তারা। তবে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিশ্বের আধুনিক সব প্রযুক্তির সমন্বয় থাকছে পুরো প্রক্রিয়ায়। এমন আশঙ্কার কোনো সুযোগ নেই।

■ কারিকা, এপ্রিল ১১, ২০১৮

স্বপ্ন হলো সত্যি মহাকাশে বাংলাদেশ

মহাকাশের অজানার পানে বাংলাদেশের একটি স্যাটেলাইট ছুটবে–লাল-সবুজের বাংলাদেশ এই স্বপ্নে বিভোর ছিল অনেক দিন থেকে। অবশেষে সেই স্বপ্ন হলো সত্যি। মহাকাশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট (কৃত্রিম উপগ্রহ) বঙ্গবন্ধু-১। দেশীয় অর্জনের ক্যানভাসে পড়ল তুলির আরেকটি রঙিন আঁচড়।

মহাকাশে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি সেরে রাখা হয়েছিল আগেই। নানা কারণে বেশ কয়েকবার পেছানোর পর ১২ই মে শনিবার রাত ২টা ১৪ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিক হলো।

এর আগে বাংলাদেশ সময় ১১ মে রাত ৩টা ৪৭ মিনিটে বঙ্গবন্ধু-১ উৎক্ষেপণের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ মিনিটে এসেই থমকে যায় সেকেন্ডের কাঁটা। রকেটের যাত্রা (স্টার্টআপ মোড) শুরু হওয়ার সময় কারিগরি ত্রুটির কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়।

স্যাটেলাইটটি মহাকাশে পাঠানোর কাজ করছে মহাকাশ গবেষণা সংস্থা স্পেসএক্স। তাদের 'ফ্যালকন-৯' রকেটে করে বঙ্গবন্ধু-১ যাত্রা শুরু করে। এটি নিয়ন্ত্রণ করা হবে বাংলাদেশের গাজীপুর থেকে। এ জন্য গাজীপুরের জয়দেবপুরে তৈরি করা হয়েছে গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন। বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হবে রাঙামাটির বেতবুনিয়া গ্রাউন্ড স্টেশন।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ সেবার সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে। দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ হবে। স্যাটেলাইটভিত্তিক টেলিভিশন সেবা ডিটিএইচ (ডাইরেক্ট টু হোম) ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজেও এ স্যাটেলাইটকে কাজে লাগানো যাবে।

মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের অবস্থান হবে ১১৯ দশমিক ১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। এই কক্ষপথ থেকে বাংলাদেশ ছাড়াও সার্কভুক্ত সব দেশ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মিয়ানমার, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমিনিস্তান ও কাজাখস্তানের কিছু অংশ এই স্যাটেলাইটের আওতায় আসবে।

দেশের প্রথম এ স্যাটেলাইট তৈরিতে খরচ ধরা হয়েছিল ২ হাজার ৯৬৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১ হাজার ৩১৫ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকার ও বাকি ১ হাজার ৬৫২ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে নেওয়া হয়েছে। এ ঋণ দিয়েছে বহুজাতিক ব্যাংক এইচএসবিসি। তবে শেষ পর্যন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নে খরচ হয়েছে ২ হাজার ৭৬৫ কোটি টাকা।

স্যাটেলাইট তৈরির এই পুরো কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়িত হয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) তত্ত্বাবধানে। তিনটি ধাপে এই কাজ হয়েছে। এগুলো হলো স্যাটেলাইটের মূল কাঠামো তৈরি, স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ ও ভূমি থেকে নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্রাউন্ড স্টেশন তৈরি।

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের মূল অবকাঠামো তৈরি করেছে ফ্রান্সের মহাকাশ সংস্থা থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস। স্যাটেলাইট তৈরির কাজ শেষে গত ৩০ মার্চ এটি উৎক্ষেপণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় পাঠানো হয়। সেখানে আরেক মহাকাশ গবেষণা সংস্থা স্পেসএক্সের 'ফ্যালকন-৯' রকেটে করে স্যাটেলাইটটি মহাকাশে যাত্রা শুরু করে।

পথচলা শুরু যেভাবে

বাংলাদেশে প্রথম স্যাটেলাইট নিয়ে কাজ শুরু হয় ২০০৭ সালে। সে সময় মহাকাশের ১০২ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে কক্ষপথ বরাদ্দ চেয়ে জাতিসংঘের অধীন সংস্থা আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নে (আইটিইউ) আবেদন করে বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলাদেশের ওই আবেদনের ওপর ২০টি দেশ আপত্তি জানায়। এই আপত্তির বিষয় এখনো সমাধান হয়নি। এরপর ২০১৩ সালে

রাশিয়ার ইন্টারস্পুটনিকের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের বর্তমান কক্ষপথটি কেনা হয়। বাংলাদেশ বারবার আইটিইউর কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হয়ে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে থাকলেও এখন পর্যন্ত নিজস্ব কক্ষপথ আনতে পারেনি।

জাতিসংঘের মহাকাশবিষয়ক সংস্থা ইউনাইটেড নেশনস অফিস ফর আউটার স্পেস অ্যাফেয়ার্সের (ইউএনওওএসএ) হিসাবে, ২০১৭ সাল পর্যন্ত মহাকাশে স্যাটেলাইটের সংখ্যা ৪ হাজার ৬৩৫। প্রতিবছরই স্যাটেলাইটের এ সংখ্যা ৮ থেকে ১০ শতাংশ হারে বাড়ছে। এসব স্যাটেলাইটের কাজের ধরনও একেক রকমের। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটটি বিভিন্ন ধরনের মহাকাশ যোগাযোগের কাজে ব্যবহার করা হবে। এ ধরনের স্যাটেলাইটকে বলা হয় 'জিওস্টেশনারি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট'। পৃথিবীর ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে এ স্যাটেলাইট মহাকাশে ঘুরতে থাকে।

বর্তমানে দেশে প্রায় ৩০টি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল সম্প্রচারে আছে। এসব চ্যানেল সিঙ্গাপুরসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে স্যাটেলাইট ভাড়া নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। সব মিলিয়ে স্যাটেলাইটের ভাড়া বাবদ বছরে চ্যানেলগুলোর খরচ হয় ২০ লাখ ডলার বা প্রায় ১৭ কোটি টাকা। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট চালু হলে এই স্যাটেলাইট ভাড়ার অর্থ দেশে থেকে যাবে। আবার স্যাটেলাইটের ট্রান্সপন্ডার বা সক্ষমতা অন্য দেশের কাছে ভাড়া দিয়েও বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার সুযোগ থাকবে। এই স্যাটেলাইটের ৪০টি ট্রান্সপন্ডারের মধ্যে ২০টি ভাড়া দেওয়ার জন্য রাখা হবে।

রাকিব হাসান ও আশরাফুল ইসলাম
প্রথম আলো ১২ মে ২০১৮

সাদা মনের মানুষ এবং তাদের প্রতি করণীয়

বায়েজীদ খান
সদস্য ৭৬৩/২০০৮

আমি সৌভাগ্যক্রমে দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার, বিশিষ্ট লেখক মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক, সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। আমি তাদের কথা, উপদেশ শুনেছি আবার অটোগ্রাফও নিয়েছিলাম। তারা চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু এক অতৃপ্ত প্রশ্ন আমার মধ্যে তাদের কথায় জেগে উঠেছিল যা আমি করতে পারিনি তা হলো 'সাদা মনের মানুষ আসলে কী এবং কারা?'

প্রশ্ন রয়েই গেল। আমিও চলে এলাম। নির্জন গ্রামের পথ দিয়ে হাঁটতেই থমকে দাঁড়ালাম জনৈক এক ভদ্র, জ্ঞানী ব্যক্তির সামনে। তখন সেই প্রশ্নটি করলামও। তিনি মুচকি হাসলেন। তারপর ৬০ বছর আগের ইংরেজি মনে করে হয়তো বললেন,

They who take care without hesitation
They who give without expectation.

তাড়াহুড়া করে বলতে লাগলেন,

যারা প্রচলিত সমাজ কর্মের শুধু উর্ধ্বেই থাকেন না একটি কাঙ্ক্ষিত সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখাও সৃষ্টি করেন, যারা আত্মপ্রত্যয়ী সৈনিকের মতো যুদ্ধ করে অহিংস পথে; যাদের সুখ মস্তিষ্কে খেলা করে মঙ্গল আর কল্যাণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন; যারা সমাজ, দেশ, জাতি গড়ার শপথ নিয়েই শুধু ক্ষান্ত নন বরং শপথ করার কাজে নিয়েজিত। যারা বয়সের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে আজও একটু একটু করে প্রতিদিন সমাজের অকল্যাণের শিক ধরে টান দেন, ছেঁড়ার চেষ্টা করেন; যাদের স্বপ্ন বাসনাই অন্যের কল্যাণ মঙ্গল; যারা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটি পরোপকার না করলে, নতুন কিছু না আবিষ্কার করলে নিজেকে হীন মনে করেন। যারা বিপথগামীদের পথের সন্ধান দেন, বলেন দেখি জীবনের পরিক্রমের নিয়োজিত; যাদের মগজের কোষে কোষে বিশুদ্ধতার আন্দোলন, যারা আজন্ম কল্যাণীর হাসি হেসে থাকেন অন্যের বিজয়ে। হৃদয় থেকে ধর্ম আর অধর্ম এর দ্বন্দ্বময় অবস্থা যার কাছে অসহ্যকর। যিনি পালন করেন এক মহাধর্ম মানুষ মানুষের জন্য। নবসৃষ্টি যার কাছে সন্তানরূপী সেই তো সাদা মনের মানুষ। তিনি স্রষ্টারও পরমাত্মীয়।

আমি আনন্দে আর বিস্ময়ে মহিমান্বিত হয়ে যাই। ১৯৯০-এর কোঠা পার হয়ে যার বয়স ৯৫ বছর কি ১০০ তিনি এত জ্ঞানের উৎস। যদিও একজন সাদা মনের মানুষ ফিরতি পাবার আশায় কাজ করেন না তথাপি একটি সভ্য যুগের নাগরিক হিসেবে এই সভ্যতা নির্মাণকারী মানুষের প্রতি আমাদের উচিত ন্যূনতম সম্মান প্রদর্শন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর সুগভীর ভালোবাসা নিয়ে হাজির হওয়া তাদের সামনে তাদের মর্যাদার আসনে বসানো আমাদেরই দায়িত্ব। 'নবীন' এগিয়ে চলুক। আমরাও এগিয়ে চলি জ্ঞান আর জানার বিজয়ী হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে।

নবীন, মে-আগস্ট ২০০৯ থেকে নেওয়া

সংশোধনী : নবীন অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'নৌকা ভ্রমণ' শীর্ষক গল্পটির লেখকের নাম ভুলক্রমে মো. আনজারুল ইসলাম লেখা হয়েছে। গল্পটির লেখকের প্রকৃত নাম হবে মোছা. ফারহানা খাতুন, সদস্য নং-১০৯৯/২০১৪।

কবিতা জনপদে

শাকিল ওয়াহেদ
সদস্য ১০/১৯৮৫

সেদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের
স্নিগ্ধ ভালো লাগা ক্ষণে
মুগ্ধ বিস্ময়ে কবি কোনো এক
পূবাকাশের লালিমা দেখে।

কি যেন এক আলোড়ন
বুকের ভেতরে তার ছন্দ জাগায়
ঘোর লাগা মিঠে আকুলতা নিয়ে
লিখে ফেলে দুটি শ্রেষ্ঠ চরণ।

দুটি চরণেই কবিতা হলো
সমৃদ্ধ সুন্দর শ্রেষ্ঠতম।
সে কবিতায় সূর্যের কথা ছিল
সূর্যডোবা আঁধার ছিল
সুখের কথা ছিল
দুখের কথা ছিল।
সে কবিতায় সুন্দরের কীর্তন ছিল
বায়ুদূষণের প্রতিবাদ ছিল
গানের কথা ছিল
ঘাতকের জন্যে ঘৃণা ছিল।
সে কবিতায় মানুষের কথা ছিল
মানবতার জয়গান ছিল
বিশুদ্ধ প্রেমের চর্চা ছিল
ছিল প্রিয় পৃথিবীর জন্য ভালোবাসা।

সৃষ্টি শেষে বাগ্মী কবি
অবাক খুশিতে আত্মহারা
প্রিয় শ্রেষ্ঠ কবিতা নিয়ে
বেরিয়ে এলেন খোলা হাওয়ায়।
প্রিয় কবিতার হাতটি ধরে
ঘুরে এলেন বহু জনপদ
জনারণ্যে মিশে শেষে
প্রিয় জনতাকে বলেন ডেকে
নাও, তোমাদের জন্যে
কবিতা লিখেছি, নাও।

কি যে হয়! বুক কাঁপে ভিড়ের
মুখে মুখে ফেরে চরণ দুটি
বুকে বুকে বাজে চরণ দুটি
চোখে চোখে জ্বলে চরণ দুটি।
তৃপ্ত কবি ফিরে চলেন ঘরে
একা! শুধু একা!
কবিতা জনপদেই!

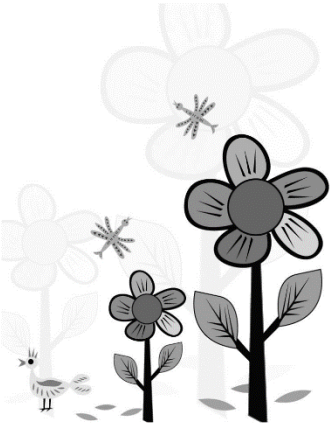

অনার্স লাইফ

মোছা. আরিফা খাতুন
সদস্য ৯৮৫/২০১২

অনার্স লাইফটা অনেক মজার
ঘোরাফেরা আড্ডাতে দিন হয় পার
ক্যাম্পাসে দিন কাটে সকাল-বিকাল
এইভাবে দিন চলে বেসামাল।

পড়ালেখা যেমন তেমন ঘোরাঘুরি বেশি।
তাই তো একটা কথা বলি
পড়াটা ঠিক রেখে যে যা পার তাই কর।

সিগারেট, প্রেম, তাস
না হলে হবে অনার্স পাস।
ওসব কথা ধরলে বটে
হবেই সর্বনাশ।

সেশনজট আর ইয়ার ফাইভ
আসলেই অনন্য
অনার্স লাইন!

বৈশাখ

মোছা. জুলেখা আক্তার
সদস্য ১১০৬/২০১৪

শিমুল গাছটা খুব কাঁদল
তুমি ছিলে না বলে।
আর আমি আকাশ পানে তাকিয়েছিলাম
তুমি ছিলে না বলে।
সারাটা বিকেল কষ্টে কাটল
তুমি আসনি বলে।
মরুভূমিটা ছিল একলা একা
তুমি ছিলে না পাশে।
আকাশটা ছিল ভীষণ কালো
কারণ ছিল না তোমার আলো।
তাই আজ তুমি এলে,
এখন পাখিরা সব খুশিতে ডানা মেলে।
মনটা ছিল ভীষণ খারাপ
তুমি নামনি বলে।
ছিল না প্রকৃতিতে কোনো আশা
ছিল না কোথাও প্রভা,
আজ তুমি এলে আকাশে উঠল ঢেউ,
মনে হলো আমার পাশে
এল কেউ
কিন্তু না কেউ নয় সেই আমার চিরচেনা
পহেলা বৈশাখ।

প্রতিভা, তৃতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ থেকে নেওয়া

সুফিয়া কামাল নারীমুক্তির জননী সাহসিকা

'আমাদের যুগে আমরা যখন খেলেছি পুতুল খেলা
তোমরা এ যুগে সেই বয়সেই লেখাপড়া কর মেলা।
আমরা যখন আকাশের তলে ওড়ায়েছি শুধু ঘুড়ি
তোমরা এখন কলের জাহাজ চালাও গগন জুড়ি।'
['আজিকার শিশু' কবিতার অংশবিশেষ]

কবি সুফিয়া কামাল, নামটির সাথে মিশে আছে অসংখ্য আবেগ, অনুভূতি, ভালো লাগা ও ভালোবাসার সরলতা ও নারীর আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করার মনোবল। শুধুমাত্র কবিই নন, তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, সমাজসেবক, শিক্ষক ও সংগ্রামী নেতৃত্ব। তার কবিতার স্তবকে মিশে আছে প্রেম, প্রকৃতি, ব্যক্তিগত অনুভূতি, বেদনাময় স্মৃতি, স্বদেশের প্রতি মমতা, মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা এবং ধর্মীয় আবেগ।

সহজ কিন্তু আবেগী ভাষার প্রয়োগ ও মননশীল শব্দচয়ন তার প্রতিটি কবিতায় অন্য মাত্রা যুক্ত করে। তার লেখার ঝুলিতে কবিতা ছাড়াও আরও আছে ভ্রমণকাহিনি, ডায়েরি, ছোটগল্প, উপন্যাস ও শিশুতোষ গ্রন্থ। সব মিলিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০টিরও বেশি। সেসবের মধ্যে কেয়ার কাঁটা, মায়া কাজল, মন ও জীবন, উদাত্ত পৃথিবী, অভিযাত্রিক, ভ্রমণকাহিনি 'সোভিয়েত দিনগুলি', স্মৃতিকথা 'একাত্তরের ডায়েরি' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অনন্ত সূর্যাস্ত-অন্তে আজিকার সূর্যাস্তের কালে
সুন্দর দক্ষিণ হস্তে পশ্চিমের দিকপ্রান্ত-ভালে
দক্ষিণা দানিয়া গেল, বিচিত্র রঙের তুলি তার
বুঝি আজি দিনশেষে নিঃশেষে সে করিয়া উজাড়
দানের আনন্দ গেল শেষ করি মহাসমারোহে।
['সাঁঝের মায়া' কবিতার অংশবিশেষ]

বরিশালের আড়িয়াল খাঁ নদীর পাড়ে শায়স্তাবাদে জন্ম এই মহিয়সী নারীর। ক্যালেন্ডারের পাতায় সেদিন ছিল ১৯১১ সালের ২০ জুন। পিতা সৈয়দ আবদুল বারী ছিলেন সেই সময়কার একজন খুব নামকরা উকিল। কিন্তু পিতার স্নেহ খুব বেশি বছর দীর্ঘায়িত হয়নি সুফিয়া কামালের জন্য। সুফিয়ার সাত বছর বয়সেই বাবা গৃহত্যাগী হন। ফলে পিতার অনুপস্থিতিতে মা সৈয়দা সাবেরা খাতুন অসম্ভব স্নেহ-ভালোবাসায় লালন পালন করতে থাকেন শিশু সুফিয়াকে।

জীবনের শুরুটা কবি সুফিয়ার জন্যে মোটেও আনন্দদায়ক ছিল না। নারীরা তখন সমাজে অনেকটাই পশ্চাৎপদ ছিল। চার দেয়ালের বদ্ধ ঘরে জীবন কাটানোর জন্য প্রস্তুত হতে চাননি তিনি, সমাজের সাথে ঠিকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিল না তার মন। প্রেরণা ছিলেন শুধুই কবির মা সৈয়দা খাতুন। রক্ষণশীল পরিবার বলে, ঘরে মেয়েদের পড়ালেখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। মায়ের হাত ধরে হাতে প্রথম বই পাওয়ার আনন্দ পান তিনি। বাড়িতে উর্দুর চল থাকলেও নিজের চেষ্টায় বাংলায় লিখতে পড়তে শিখেন তিনি। গৃহবন্দী জীবনে নিজেকে ধীরে ধীরে স্বশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে থাকেন কবি সুফিয়া।

অন্তর তৃষা মিটাতে এনেছে মমতার মধু-সুধা?
রিক্তের প্রাণ ভরিবে কি আজ পুণ্যের আশ্বাসে?
অবহেলিতেরে ডেকে নেবে ঘরে, তাদের দীর্ঘশ্বাসে।
ব্যথিত মনের সম বেদনায় দূর করি দিয়ে প্রাণজুড়াবে,
শুনাবে ভরসায় ভরা আগামী দিনের গান?
['মিটাতে জঠর ক্ষুধা' কবিতার প্রথম স্তবক]

সুফিয়া কামালের জীবনের দিক পরিবর্তনের সূচনা হয় আরেক মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে। ১৯১৮ সালে মায়ের সাথে যখন প্রথম কলকাতায় যান তিনি, তখন তার পরিচয় হয় বেগম রোকেয়ার সাথে। বেগম রোকেয়ার দর্শন, নারী জাগরণের মনোভাব এবং সাহিত্যানুরাগ ভীষণভাবে নাড়া দেয় শৈশবের সুফিয়াকে।

শৈশবের গণ্ডি না পেরোতেই রক্ষণশীল পরিবারের নিয়মানুযায়ী মাত্র ১৩ বছর বয়সে মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে সুফিয়ার বিয়ে হয়। স্বামী নেহাল হোসেন যেন সুফিয়ার জীবনে এক অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদ হয়ে এসেছিলেন। নেহাল হোসেন নিজে লেখক, সাহিত্যিক ও সমাজসেবী ছিলেন। স্ত্রীর এসব বিষয়ে আগ্রহ দেখে নেহাল হোসেন বিভিন্নভাবে সুফিয়াকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। সাধারণ এক গৃহিণী থেকে সাহিত্যের আলোয় নিজেকে মেলে ধরার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯২৩ সালে তিনি রচনা করেন তার প্রথম গল্প 'সৈনিক বধূ', যা বরিশালের সেসময়কার জনপ্রিয় 'তরুণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯২৫ সালের দিকে মহাত্মা গান্ধী যখন বরিশাল আসেন তখন সুফিয়ার সাথে দেখা হয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধীর

জীবনদর্শন এবং অহিংসা আন্দোলন অল্পবয়সী সুফিয়াকে এতোটাই নাড়া দিয়ে যায় যে তিনি কিছুদিন চরকায় সুতা কাটতে শুরু করেন। এর পাশাপাশি তিনি নারী কল্যাণমূলক সংগঠন 'মাতৃমঙ্গল'-এ যোগ দেন।

স্বামীর প্রেরণায় সুফিয়া কামাল ধীরে ধীরে কবিতা লেখায় মনোনিবেশ করেন। কলকাতায় তার আরেকজন বিশেষ ব্যক্তির সাথে পরিচিতি ঘটে যিনি সুফিয়া কামালের কবি জীবন পরবর্তীকালে অনেকটাই পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। তিনি হলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি সুফিয়া কামালের কবিতা পড়ে বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। ১৯২৬ সালে 'সওগাত' পত্রিকায় 'বাসন্তী' কবিতাটি প্রকাশের মাধ্যমে বাংলার সাহিত্যাঙ্গনে সুফিয়া কামাল প্রথম কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

'আমার এ বনের পথে
কাননে ফুল ফোটাতে
ভুলে কেউ করত না গো
কোনদিন আসা-যাওয়া।
সেদিন ফাগুন-প্রাতে
অরুণের উদয়-সাথে
সহসা দিল দেখা
উদাসী দখিন হাওয়া।'
['বাসন্তী' কবিতার অংশবিশেষ]

১৯২৯ সালের দিকে বেগম রোকেয়ার একটি মুসলিম মহিলা সংগঠন যার নাম ছিল 'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলাম'-এ কবি সুফিয়া কামাল যোগদান করেন। এখানে নারীদের উন্নতি, শিক্ষা এবং সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হতো। সুফিয়ার জীবনে বেগম রোকেয়ার এমনই প্রভাব ছিল যে বেগম রোকেয়ার সামাজিক আন্দোলনে সবসময় তার পথ অনুসরণ করে গেছেন। এছাড়াও তিনি রোকেয়ার উপর অনেক কবিতা রচনা করেন এবং পরবর্তীতে 'মৃত্তিকার ঘ্রাণ' নামে একটি কাব্য সংকলনও উৎসর্গ করেন। ১৯৩৭ সালে সুফিয়া কামালের গল্পের সংকলন 'কেয়ার কাঁটা' প্রকাশিত হয়। এর ঠিক পরের বছর তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাঁঝের মায়া' প্রকাশিত হয়, যার প্রস্তাবনা লেখেন স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলাম। বইটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুফিয়া কামালের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এর পর থেকেই মূলত সুফিয়া কামালের কবি হিসেবে সুখ্যাতি চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

তবে কবি সুফিয়া কামালের জীবনেও ছিল অনেক চড়াই উৎরাই। জীবনের এমন কিছু সময় তাকে অতিবাহিত করতে হয়েছে, যখন তাকে নিরন্তর যুদ্ধ করতে হয়েছে পশ্চাৎপদ সমাজ এবং ঘুণে ধরা সংস্কৃতির সাথে। জীবনের সবচাইতে কঠিন পরীক্ষাটি কবির জীবনে আসে ১৯৩২ সালে, যখন তার স্বামী আকস্মিক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। স্বামীকে হারিয়ে একেবারে একা হয়ে পড়েন কবি। সেই সময়কার প্রেক্ষিতে ছোট্ট একটা মেয়েকে নিয়ে একা একা বাস করা মোটেও সহজসাধ্য ছিল না। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করতে কলকাতা কর্পোরেশন প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতার পেশা বেছে নেন। ১৯৪১ সালের শেষ পর্যন্ত তিনি এই পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। এই স্কুলেই সৌভাগ্যবশত তার পরিচয় হয় খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক আবদুল কাদির এবং পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের সাথে।

১৯৩৯ সালের দিকে কবি চট্টগ্রামের লেখক ও অনুবাদক কামালউদ্দীন আহমদকে বিয়ে করেন। সেই থেকে তিনি 'সুফিয়া কামাল' নামে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করেন। কবির সংগ্রামী জীবনের পথে স্বামী কামালউদ্দীনকেও নিরন্তর কাছে পেয়েছেন।

সুফিয়া কামালের সারাটি জীবন কেটেছে নারীদের স্বাধীনতা এবং নারীদের শোষণ বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টায়। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় যখন ধর্মীয় দাঙ্গা বাধে তখন তিনি কলকাতার সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ এলাকায় লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজে একটি আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৯৪৯ সালে বেগম রোকেয়ার সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থের প্রধান চরিত্র সুলতানার নামানুসারে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৯৪৮ সালে সমাজসেবা ও রাজনীতি হয়ে ওঠে সুফিয়া কামালের ধ্যান-জ্ঞান। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গঠিত শান্তি কমিটিতে যোগ দেন তিনি। ঐ একই বছরই তাকে সভানেত্রী করে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি' গঠিত হয়।

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধে সুফিয়া কামালের অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসনের কারণে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কবি সুফিয়া কামাল এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে তিনি 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন' নামে একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৬৯ সালে 'মহিলা সংগ্রাম পরিষদ' যা বর্তমানে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নামে পরিচিত, তার হাত ধরেই গঠিত হয়। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ মহিলা পুনর্বাসন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন কমিটি এবং দুস্থ পুনর্বাসন সংস্থা, ছায়ানট, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন এবং নারী কল্যাণ সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৬ সালে শিশুদের সংগঠন কচিকাঁচার মেলা প্রতিষ্ঠার সাথেও সরাসরি জড়িত ছিলেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা হোস্টেলকে 'রোকেয়া হল' নামকরণের দাবিও তোলেন কবি সুফিয়া কামাল।

সুফিয়া কামাল ৫০টিরও অধিক পুরস্কার লাভ করেছেন। এর মধ্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, বেগম রোকেয়া পদক, জাতীয় কবিতা পুরস্কার ও স্বাধীনতা দিবস পদক উল্লেখযোগ্য। সুফিয়া কামালের কবিতা চীনা, ইংরেজি, জার্মান, ইতালিয়ান, পোলিশ, রুশ, ভিয়েতনামিজ, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর ৮৯ বছর বয়সে ঢাকায় কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলাদেশি নারীদের মধ্যে তাকেই প্রথম পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

কবিদের মৃত্যু নেই; তাই তো তিনি এখনো পাঠকদের সাথে মিশে আছেন তার লেখা কবিতার প্রতিটি চরণে।

'হোক, তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?'
কহিলাম 'উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?'
কহিল সে কাছে সরি আসি–
'কুহেলী উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী–
গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে
রিক্ত হস্তে। তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোন মতে।'
['তাহারেই মনে পড়ে' কবিতার শেষ কিছু পঙক্তি]

একটি পরিবেশ দূষণমুক্ত পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা

২২ এপ্রিল। বিশ্ব ধরিত্রী দিবস। পরিবেশকে সুস্থ, সুন্দর ও দূষণমুক্ত রাখার প্রত্যয়ে এ দিবসটি আমরা পালন করছি ৪৮ বছর ধরে। প্রতিটি জন্মদিনে আগামীর জন্য নতুন প্রত্যয়ের কথা চিন্তা করে ইংরেজি 'বার্থ ডে'-এর সঙ্গে মিলিয়ে দিবসটির নাম রাখা হয়েছিল 'আর্থ ডে'। মানুষের মধ্যে পরিবেশসচেতনতা সৃষ্টি এবং বিশ্বের পরিবেশকে কীভাবে বাসযোগ্য রাখা যায়, সেটিই এ দিবসের মূল উপজীব্য। ১৯৭০ সালে এ দিবসটি প্রথম উদ্‌যাপন করা হয় এবং বর্তমানে প্রায় প্রতিটি দেশেই দিবসটি পালিত হচ্ছে। প্লাস্টিকদূষণের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এ বছর বিশ্ব ধরিত্রী দিবসের মূল থিম বা প্রতিপাদ্যে সবার প্রতি প্লাস্টিকদূষণ বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

শিল্পোন্নয়নের ফলে একসময় আমেরিকাসহ শিল্পোন্নত দেশগুলোতে কালো ধোঁয়ার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছিল। মানুষ বুঝতে শুরু করে যে এই কালো ধোঁয়ার ফলে শিশুদের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার এবং অন্যান্য দূষণের কারণে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির বিষয়টিও তখন সামনে চলে আসে। ১৯৬৯ সালে সানফ্রান্সিসকোর শান্তিকর্মী জন ম্যাককোনেল নিরাপদ পরিবেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্ব ধরিত্রী দিবস পালনের বিষয়টি সামনে আনেন। ম্যাককোনেল ২১ মার্চ দিবসটি পালনের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিনের সিনেটর গেলার্ড নেলসন ২২ এপ্রিল দিবসটি পালনের প্রস্তাব করেন এবং সর্বপ্রথম ১৯৭০ সালের ২২ এপ্রিল প্রায় ১৫০ বছর শিল্পোন্নয়নের ফলে পরিবেশের ক্ষতির দিকটিকে তুলে ধরতে হাজার হাজার মানুষ একটি সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। আর সেটিই বিশ্ব ধরিত্রী দিবসের সূচনা, বলা চলে পরিবেশ আন্দোলনের সূচনাও এদিনই। আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্যই পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মানুষ অনেকটাই নির্দয় ব্যবহার করছে প্রকৃতির সঙ্গে। পৃথিবীর ওজোনস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে এই ওজোনস্তর। শিল্পবর্জ্যের দূষণে নদীগুলো দূষিত হয়ে পড়ছে। বনভূমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শিল্প-কারখানার দূষণ থেকে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। বাড়ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা। এসবই মানুষসহ পৃথিবীর জীবজগতের জন্য হুমকি। কিন্তু মানুষ সচেতন হলে পরিবেশের এ ক্ষতিকে অনেক কমানো যায়। বৃক্ষনিধন কমানো, বৃক্ষরোপণ, বায়ুদূষণ কমানোর জন্য রাস্তায় গাড়ির পরিমাণ কমানো, অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার কমিয়ে জ্বালানি সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত বা দলগত পর্যায়ে পরিবেশকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

অতিমাত্রায় প্লাস্টিকের ব্যবহার আজ বিশ্ববাসীর জন্য বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এখন প্রায় এমন কোনো দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রী নেই, যা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা যায় না। সহজলভ্য ও সুলভ হওয়ায় প্লাস্টিকের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে আশঙ্কাজনকভাবে। ৩০-৪০ বছর আগেও আমরা মাটির তৈরি বাসন-কোসন, তৈজসপত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু বর্তমানে সেই স্থান দখল করেছে প্লাস্টিক। কয়েক বছর আগেও ধান-চাল সংরক্ষণে পাটের বস্তার ব্যাপক ব্যবহার ছিল। এখন সেই স্থান দখল করেছে প্লাস্টিকের বস্তা। পলিথিন ব্যাগ মানুষের হাতে হাতে।

প্লাস্টিক বা পলিথিনের মূল সমস্যা হলো, এটি বায়োডিগ্রেডেবল বা পচনশীল নয়। এটি পচে মাটির সঙ্গে মিশে যায় না। ফলে প্লাস্টিক যে নালা বা ড্রেনের মধ্যে পড়ে সেটিকে বন্ধ করে দেয়। নদীর তলদেশে পলিথিন জমা হয়ে গভীরতা কমিয়ে দেয় এবং জলজ প্রাণীদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। সাগর-মহাসাগরের পানিকে দূষিত করে সাগরের বিশাল প্রাণিকুলেরও ক্ষতির কারণ হয়। আমরা বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণের জন্য প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার করি। এমনকি চা-কফি খাওয়ার জন্য প্লাস্টিকের কাপ, গ্লাস ব্যবহার করছি, যা মানবদেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর। গবেষক ও চিকিৎসকদের মতে, ক্যান্সারসহ বেশ কিছু রোগের কারণ হতে পারে প্লাস্টিকের ব্যবহার। পরিবেশ, প্রকৃতি ও মানবস্বাস্থ্যের ওপর প্লাস্টিকের এই ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবারের বিশ্ব ধরিত্রী দিবসে। এই ধরিত্রীর পরিবেশ রক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশ অনেক রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন দেশ এ লক্ষ্যে পরিবেশবিষয়ক অনেক আইন তৈরি করেছে এবং সেসব আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশকে সুন্দর রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে অন্যান্য চেষ্টার পাশাপাশি মানুষের সচেতনতা ও পরিবেশবিষয়ক জ্ঞানার্জন ও উপলব্ধি খুবই জরুরি ও কার্যকর।

বিশ্ব ধরিত্রী দিবস শুধু দলগতভাবে নয়, প্রত্যেক মানুষকে প্রতিদিন পরিবেশ রক্ষার জন্য কিছুটা ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সচেতনভাবে প্লাস্টিকসামগ্রী ব্যবহার করে, তাহলেই সে মাটি এবং পানিদূষণ রোধে ভূমিকা রাখছে। প্লাস্টিকসামগ্রী বা পলিথিন ব্যাগ একবার ব্যবহার করে ফেলে না দিয়ে তা আবার ব্যবহার করা যায় বা রিসাইক্লিং করে নতুন সামগ্রী তৈরি করা যায়। একজন মানুষ পরিবেশসচেতন হলে তিনি সড়ক, পার্ক অথবা যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবেন না বা পড়ে থাকা দেখলে তা তুলে নিয়ে সঠিক জায়গায় ফেলে দিতে পারেন। আমরা যদি ব্যক্তিপর্যায়ে মানুষকে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করতে পারি, তাহলেই বৃহত্তর পরিমণ্ডলে একসময় বড় পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। মানুষের মনে এই বিশ্বাস জন্মানো দরকার যে তাদের জীবনে প্রতিটি দিনই ধরিত্রী দিবস এবং সে কারণে এই পৃথিবীর যত্ন নেওয়া দরকার প্রতিদিনই।

ধরিত্রী সরকার সবুজ
কালের কণ্ঠ ২২ এপ্রিল ২০১৮

লেখক : মেধা লালন প্রকল্পের ১৯৮৫ ব্যাচের সদস্য। প্রকৌশলী, ইংল্যান্ডের গ্রিনিচ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন বিষয়ে মাস্টার্স।

মানুষ মানুষের জন্য

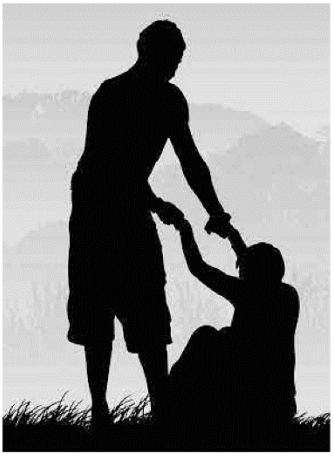

সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষকে বুদ্ধি ও আত্মোপলব্ধি ও জ্ঞান দেয়া হয়েছে–অন্যান্য জীবকে যা দেয়া হয়নি। পৃথিবীতে আল্লাহ তার প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত যখন নেন তখন ফেরেশতারা আল্লাহকে জানায়, তারাই তো তার ইবাদত বন্দেগীর জন্য যথেষ্ট আবার মানুষ সৃষ্টি করা কেন। আল্লাহ বলেন, আমি যা জানি তা তোমরা জান না। তিনি মাটি থেকে প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করলেন এবং তাকে কিছু জিনিসের নাম শিক্ষা দিলেন। ফেরেশতাদের সামনে আদমকে ডেকে আল্লাহ তার জ্ঞানের পরীক্ষা নিলেন। আদম (আ.) তার জ্ঞানের দ্বারা সকল জিনিসের নাম বলতে পারলেন যা ফেরেশতারা বলতে পারলেন না। আল্লাহ তখন ফেরেশতাদের আদমকে সিজদা করার নির্দেশ দিলেন। ইবলিশ ব্যতিত সবাই সেজদা করল অর্থাৎ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার কলে নিল। ইবলিশ বরং প্রতিজ্ঞা করল মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে খর্ব করার কাজে সে সদা নিয়োজিত থাকবে–তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। আল্লাহর একান্ত প্রত্যাশা থেকে গেল মানুষ বরবারই তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়ে যাবে। এবং এই ষড়যন্ত্রে শয়তানের কাছে পরাভূত হবে না।

সেই থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার সংগ্রাম শুরু। মানুষ যখনই শয়তানের ষড়যন্ত্রে পা দিয়েছে অর্থাৎ শয়তানের অনুসরণে ব্রতি হয়েছে তখন সে বিপথগামী হয়েছে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় খুইয়েছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করার ফলে তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে অশেষ শাস্তি ও যন্ত্রণাভোগ। মানুষ মানুষের জন্য এজন্যে যে একা মানুষ শয়তানের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় সক্ষম না হলে একে অপরকে সহায়তা করবে। দুর্বল মানুষ সবল মানুষের সহায়তা পেয়েই নিজের দুর্বলতার ব্যর্থতাকে জয় করবে এটাই প্রত্যাশা। জীবনের অথৈ নদী সমস্যার পাহাড় আর দৈব দুর্বিপাকের সকল বাধা পেরুতে অন্যের সহায়তা ও সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন। সবল দুর্বলের জন্য, শিক্ষিত অশিক্ষিতের জন্য, ধনী দরিদ্রের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে টেনে তুলবে। এবং আল্লাহর সেই মহৎ ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন প্রতিফলন ঘটাবে।

সমগ্র মানুষ এক বৃহৎ সংসারের বাসিন্দা। সংসারে ছোট বড় সবাই থাকে বড়রা ছোটকে স্নেহ করবে–ছোটরা সম্মান ও সমীহ করবে বড়দের। ভালো কাজে নির্দেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধের নিয়মকানুন মেনে চলবে ছোট বড় সবাই। একে অন্যের দুঃখে দৈন্যে সমমর্মিতা প্রকাশ করবে। এটাই পারিবারিক সুখ শান্তির পূর্বশর্ত। পারিবারিক সুখ শান্তি চিন্তাভাবনা যদি সমাজ দেশ ও বিশ্বব্যাপী ব্যাপৃত হয় তাহলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ এবং একে অপরকে শোষণ শাসন ও অবদমনের নামে যে অশুভ প্রয়াস প্রচেষ্টা চলে তার আর প্রয়োজন পড়ে না–তার অস্তিত্ব থাকে না। আমরা সবাই এক বিশ্ব পরিবারের সদস্য এই চিন্তা চেতনা সকলের মধ্যে জাগ্রত থাকলে ধনী দরিদ্র বৈষম্য, সন্ত্রাস পাল্টা সন্ত্রাস, অবরোধ, অধিকার দাতা গ্রহীতার স্বার্থ হয়ে টানাটানি হানাহানি আর থাকে না। সকল মানুষ এক অভিন্ন চিন্তাচেতনা নিয়ে অগ্রসর হলে যুদ্ধ বিগ্রহে এতটা সময়, সম্পদ অপচয়ের প্রয়োজন পড়ে না।

মানুষই মানুষের বড় প্রতিপক্ষ। মানুষই সভ্যতা গড়ছে আবার সেই মানুষই নিজের বানানোর মারণাস্ত্র দিয়ে তার গড়া সভ্যতা ধ্বংস করছে। একের বাড়াবাড়ির পরিণামে অন্যের সর্বনাশ হচ্ছে। এ সবই যেন শয়তানের সেই চ্যালেঞ্জের সপক্ষে গড়ে তোলা দুর্ভাগ্যের দেয়াল। মানুষ পৃথিবীতে হানাহানিতে কালাতিপাত করে আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে দিয়ে ফেরেশতাদের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিলনই ঘটাচ্ছে যেন! অথচ মানুষ মানুষের জন্য সহমর্মিতাবোধের এই মূল্যবোধ যদি সকলের মধ্যে কাজ করত তাহলে হানাহানি অনেকখানি উপশম হতো। মানুষ দুঃখ দৈন্য দারিদ্র্য ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। এগুলি সৃষ্টি হয়েছে মানুষ মানুষের বিভেদ সৃষ্টির উদগ্র বাসনা থেকে। সহায় সম্পদ বণ্টন ও ব্যবহার প্রক্রিয়ায় ত্রুটি বিচ্যুতি ও স্বার্থ বুদ্ধির ভেদাভেদের কারণে। মানুষ মানুষের জন্য এই মূল্যবোধের ব্যাপক বিকাশই মানবসভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি ও নিরাপদ বিশ্ব রচনার একমাত্র উপায়।

দুর্বল মানুষ যদি জীবনের অথৈ নদী পাড়ি দিতে সবল মানুষের সাহায্য প্রার্থী হয় এবং সবল মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে তাকে যদি উদ্ধার করে তাতে তো তার কোনো ক্ষতি নেই। বরং দুর্বল মানুষ সবল মানুষের সহায়তায় ত্রাণ বা উদ্ধার পেয়ে সমাজে ঠাই পেয়ে সমাজ ও সংগঠনকে শক্তিশালী করার সুযোগ পাবে। সকলেরই কল্যাণ হবে। অর্থনীতি বলি আর সমাজ সংস্কৃতি বলি সবই উন্নত হয় অগ্রসরমান হয় সকলেরই সমন্বিত অংশগ্রহণে এবং প্রয়াস প্রচেষ্টায়।

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
সাবেক সচিব, ইআরডি ও চেয়ারম্যান এনবিআর
মেম্বার, গভর্নিং বোর্ড, এইচডিএফ

ট্যাকটিকস অব টেসলা কোড

মানুষ। মানসম্মত হুঁশ তাদের। সে কারণেই তাদের ডাকা হয় এ নামে। সভ্য পৃথিবীর উদ্ভাবক নাকি তারাই। এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন না থাকলেও 'উদ্ভাবক' শব্দটি নিয়েই যত সংশয়। মানুষের জীবনকাল একটি ড্যাম্পড সাইন ওয়েভের মতন। শুরু, ক্রমবর্ধমান ক্ষয় ও সমাপ্তি। সময়ের লুপের ভেতরে থেকে কোনো কিছু উদ্ভাবন করা একেবারেই অসম্ভব। তবে এ জগতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসীম রহস্যের মাঝে কিছু রহস্য খুঁজে বের করা অথবা তার প্রক্রিয়াকরণকে যদি উদ্ভাবন হিসেবে চালিয়ে দেয়া যায় তাহলে এ নিয়ে আর তর্কাতর্কি না করলেও চলে।

রহস্য খোঁজার জন্যে সবচেয়ে কার্যকর সার্চলাইটটি হচ্ছে গণিত। গণিতের খেলার সবটুকু মানুষের জ্ঞানের সীমানার ভেতরে নেই। আর যতটুকু আছে তা লিখে শেষ করাও অসাধ্য ব্যাপারে। তবে এ বিশালতা হতে সামান্য কিছুও যদি উপস্থাপন করা যায় তাহলে মন্দ হয় না।

টেসলা কোড অর্থাৎ ৩, ৬ ও ৯ এই অংক তিনটি ও তাদের বিচরণ নিয়ে বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলা বেশ ভেলকি দেখিয়েছেন। পরবর্তীতে টেসলা কোডের সাথে আরও অনেক কিছুর সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। অনেক ব্যাখ্যাও মিলে যায় নিখুঁতভাবে।

'কেউ যদি ৩, ৬ ও ৯ অংকগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে সে মহাবিশ্বের সকল রহস্যের চাবি পাবে।' –নিকোলা টেসলা

নিকোলা টেসলা কোনো দালানে প্রবেশের পূর্বে একটি ব্লকের চারপাশে ঠিক তিনবার করে চক্কর দিতেন। হোটেলে রুম বুক করার ক্ষেত্রে তার একমাত্র পছন্দ ছিল সে সকল রুম নম্বর যা তিন দ্বারা বিভাজ্য। তার ব্যক্তিগত উপলব্ধির সাথে মহাজাগতিক বিন্যাসের সমন্বয় রেখে নিকোলা টেসলা রহস্য উদঘাটনে বস্তুগত বিজ্ঞানের পাশাপাশি অবস্তুগত বিজ্ঞানচর্চার উপর গুরুত্বারোপ করেন। কারণ আমাদের কাজটা শুধুমাত্র খুঁজে বের করা এবং সেটা করতে যে কোনো তবে কার্যকর পন্থা অবলম্বন করা। খুব সাধারণ উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যাক। ফুল এঙ্গেল অর্থাৎ ৩৬০ ডিগ্রির অংকগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেখি।

৩+৬+০ =৯
এবার ১৮০ ডিগ্রির জন্যে
১+৮+০ = ৯
অনুরূপভাবে, ৯০, ৪৫, ২২.৫ ডিগ্রির জন্যে
৯+০ = ৯;
৪+৫ = ৯;
২+২+৫ =৯।

সবগুলো ক্ষেত্রেই অংকগুলোর যোগফল ৯।

কৌণিক হিসেবসমূহ হলো জ্যাতিমিকে বিষয়বস্তু। আর জ্যামিতির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠছে প্রচুর নকশা বা মডেল। আধুনিক স্থাপত্যের একটি ক্রিকেট ফ্যাক্টর এই টেসলা কোড। এত সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের নান্দনিকতার পেছনে রয়েছে টেসলা কোডের খেলা। সহজে বোঝার জন্যে সময় করে একবার সর্পিলাকার সিঁড়ি নিয়ে ভেবে দেখবেন।

জিনতত্ত্ব, বাস্তুতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা সবকিছুতেই রয়েছে, ৩, ৬ ও ৯-এর হারমোনি। প্রকৃতির সকল ফুল, পাতা, অবঅয় ৩ বা তার গুণিতকের প্রতিসম। অনেক প্রোগ্রামার টেসলা কোড ব্যবহার করেছেন জটিল জটিল সমাধানে। মোটকথা টেসলা কোডকে পুরো মহাবিশ্বের ব্লুপ্রিন্ট হিসেবে কল্পনা করা যায়। মহাবিশ্বের যে কোনো প্রশ্নের উত্তরের জন্যে টেসলা ৩টি জিনিসের মাধ্যমে উত্তর খুঁজতে বলেছেন। শক্তি, স্পন্দন ও কম্পাংক। শক্তি নিয়ে একটা উদহরণ দেওয়া যাক :

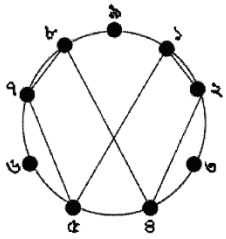

উপরের অংকগুলোর বিন্যাস দ্বারা মুক্ত শক্তি বা ফ্রি এনার্জি সিস্টেমকে বোঝানো হয়েছে। আমরা জানি, শক্তির কোনো সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। শক্তি শুধুমাত্র একরূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ শক্তির পরিবর্তনচক্র যে একটি লুপ তাতে আমরা সবাই একমত। তাহলে এখন এ লুপের রিপিটিং ফ্যাক্টর বা প্যাটার্ন এবং কন্ট্রোল পয়েন্টগুলো খুঁজে বের করে দেখি।

১
১ এর দ্বিগুণ ২
২ এর দ্বিগুণ ৪
৪ এর দ্বিগুণ ৮
৮ এর দ্বিগুণ ১৬, ১+৬ = ৭
৭ এর দ্বিগুণ ১৪, ১+৪ = ৫
৫ এর দ্বিগুণ ১০, ১+০ = ১

১ এর দ্বিগুণ আবার ২ এভাবে ১২৪৮৭৫১২৪৮৭৫১... ...এই আকারে লুপটি চলতে থাকবে। অতএব, প্রাপ্ত রিপিটিং ফ্যাক্টর ১, ২, ৪, ৮, ৭ ও ৫। চিত্রানুসারে লুপের চলার পথটিও হবে ঠিক এরকম ১ → ২ → ৪ → ৮ → ৭ → ৫ → ১।

লক্ষ করলে দেখা যাবে লুপে ৩, ৬ ও ৯ এর কোনো অস্তিত্ব নেই বরং অংক তিনটির অবস্থান পরিষ্কার করেছে যে এ অংক তিনটিই লুপটির কন্ট্রোল পয়েন্ট। ১, ২, ৪, ৮, ৭, ৫ কে যদি বাস্তব মহাবিশ্বের সমস্ত শক্তিচক্রের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে, ৩, ৬ ও ৯ এর মর্মার্থ কী দাঁড়ায়? তাদের ভূমিকায় সেখানে কি থাকবে?

এরকম হাজার প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে টেসলা কোড ব্যবহার করা যেতে পারে। যে উত্তর খুঁজতে বেরিয়ে আসবে আরও কতকগুলো প্রশ্ন যাদের উত্তরের সীমা হয়তো অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত।

মোহাম্মদ মুশফিক
পুরকৌশল বিভাগ, ৩য় বর্ষ, এমআইএসটি

দেশীয় ফলে মাতাব দেশ-বিদেশ

কৃষি বাংলাদেশে উন্নয়ন সমৃদ্ধি আর অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। কৃষি এদেশের আপামর মানুষের জীবন ও জীবিকার সাথে সুনিবিড়ভাবে জড়িত। এদেশের সিংহভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। আর গ্রামীণ কৃষি হলো কৃষি উন্নয়নের পুরোধা প্রাণ শক্তির মূল উৎস।

কৃষিতে দক্ষ যোগ্য মানবসম্পদের বিনিয়োগ কৃষিকে আরো মহিমান্বিত বিকশিত করেছে। আমাদের কৃষি এগিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্য যোগ্যতা আর প্রভাব নিয়ে আলোকিত বর্ণিল সন্মুখপানে। দেশ ও সমাজের মূল চালিকা শক্তি এদেশের গর্বিত কৃষি এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট মানুষগুলো। আর কৃষিসংশ্লিষ্ট এসব দক্ষ শিক্ষিত অভিজ্ঞ মেধাবী স্বার্থহীন সৎ ও স্বচ্ছ দেশপ্রেমিক জনশক্তির মাধ্যমে এদেশ আরো এগিয়ে গিয়ে বিশ্ব মাতাবে ভিড়বে আলোকিত বন্দরে।

আমাদের খাদ্যোপানে শর্করা, আমিষ, চর্বি এসবের উৎস এবং প্রাপ্যতা বহুমুখী এবং হাতের নাগালে। কিন্তু খনিজ এবং ভিটামিনের জন্য ফলই আর শাকসবজি প্রথম এবং প্রধান উৎস। সতেজভাবে বলা যায় খনিজ আর ভিটামিন ফল থেকে পাওয়া খুব সহজ ও সরল দেশ খাদ্য তথা দানাদারখাদ্যে স্বয়ংভরতা অর্জন করলেও পুষ্টির বিচারে, দৃষ্টিকোণে আমরা এখনো পিছিয়ে আছি। উন্নতি করছি কিন্তু কাঙ্ক্ষিত মাপে না। চাহিদা অনুযায়ী শর্করার প্রতুল যোগান থাকলেও আমিষের যোগান সে মাত্রায় না। আমিষের চাহিদা মেটানোর জন্য বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। কিন্তু আমাদের সচেতনতার অভাবে ঘাটতির কারণে ভিটামিন খনিজের প্রয়োজনীয় পরিমাণ গ্রহণ করতে পারছে না। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী নানাবিদ অপুষ্টিজনিত রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছে না। সার্বিক বাড়বাড়তি এবং প্রয়োজনীয় বিকাশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

অথচ সুস্থ ও মেধা সম্পন্ন জাতি গঠনে মূল দাওয়াই পুষ্টিসমৃদ্ধ উপদান উপকরণ আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে আছে। বিশেষ করে শাকসবজি ফলমূল। আবার এর মধ্যে যোগ্যতার কারণে ফলের অবদান শীর্ষে চলে আসে। কেননা ফল খাদ্য, পুষ্টির আধার, বিশেষ করে ভিটামিন খনিজের ভান্ডার, রোগবালাই দমন প্রতিরোধ করে, বাড়বাড়তি বিকাশে অবদান রাখে, স্বাস্থ্য রক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে, পথ্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ, বাণিজ্যিক মূল্য অনেক বেশি, রান্না ছাড়া সরাসরি খাওয়া যায় বিশুদ্ধ পুষ্টি উপাদান ফলে ভরপুর। খেলেই লাভ।

অতীতে ফলের প্রাপ্যতা অনেক ছিল কিন্তু সচেতনতা কম ছিল। এখন সচেতনতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়েছে, বেড়েছে ফলের প্রাপ্যতাও। আমাদের আছে ১৩০ ধরনের গর্বিত ফল ভান্ডার। এর মধ্যে ৭০টি বিশেষ প্রচলিত ও অপ্রচলিত। এসব ফল পুষ্টিতে তুষ্টি মিষ্টিতে গুণে মানে দামে অতুলনীয়। ফলভিত্তিক পুষ্টি তথা ভিটামিন খনিজ অন্যান্য খাদ্যে তুলনায় সহজলভ্য, পরিমাণে বেশি এবং সতেজ বিশুদ্ধ।

মানুষের স্বাস্থ্য বুদ্ধি মেধা মনন বিকাশে ফলের পুষ্টি অতুলনীয়। সুপরিকল্পিতভাবে ফল ব্যবস্থাপনায় সুস্থ মেধাবি জনগোষ্ঠী দক্ষতার সাথে দেশের আর্থ সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারবো অনায়াসে। ফলে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী শান্তিপূর্ণ দেশ সমাজ গঠনে দেশের অদম্য অগ্রযাত্রায় ফলভিত্তিক পুষ্টি অভাবনীয় অবদান রাখবে।

শুধু অবহেলা আর অযত্নে পড়ে ছিল এতকাল আমাদের ফল। এখন সময় এসেছে সুপরিকল্পিতভাবে ফল নিয়ে ব্যপ্তরিত পরিসরে কাজ করার। বিভিন্ন কারণে ফল গাছ ফলের জাত সংখ্যা কমে যাওয়া হুমকি ও আতংকের ব্যাপার। বহুমাত্রিক সমৃদ্ধ ফল ভান্ডার থাকা স্বত্তেও এখনো কোটি কোটি টাকার ফল আমদানি করতে হয়ে প্রতিবছর।

পুষ্টিবিদগণ বলে প্রতিদিন জনপ্রতি ফল খাওয়া দরকার ২শ' গ্রাম। আর আমরা গ্রহণ করছি গড়ে ৭৮-৮০ গ্রামের মতো। চাহিদা আর প্রাপ্তিতে এখনো যোজন যোজন দূর। এ দিয়ে ফলের উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেয়া গুরুত্ব বহন করে। সুতরাং দেরি নয় সব সুযোগের প্রাপ্যতার দেশে আর অবহেলা নয় অযত্ন না অসচেতনতা নয়, সঠিকভাবে কাজে লেগে যেতে হবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে। তবেই আমরা ফল দিয়ে বাজিমাত করতে পারবো অচিরেই।

বাংলাদেশে বছরে প্রায় ২.৪৫ হাজার হেক্টর জমিতে ৪৫ লাখ টন ফল উৎপাদিত হয়। তন্মধ্যে প্রায় ৪৭ শতাংশ আসে বাণিজ্যিক বাগান থেকে এবং বাকি ৫৩ শতাংশ ফলের যোগান আসে বসতবাড়ি ও তদসংলগ্ন জমি থেকে। বাগানে উৎপাদিত ১৭.৪৫ লাখ মেট্রিক টন ৪৭%; বাগানের বাহিরে উৎপাদিত ২৬.০২ লাখ মেট্রিক টন ৫৩%। ফলের মোট চাহিদা ৭১ লাখ মেট্রিক টন। উৎপাদন ঘাটতি ২৭৫৩ লাখ মেট্রিক টন মানে ৩৫%। দেশের ফলের বার্ষিক চাহিদা উৎপাদনের প্রায় দেড়গুণ। ফলে প্রায় ২৫% ফল বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে আমদানি করতেই হয়।

দেশের বাহারি ফল ভান্ডার প্রচলিত ও অপ্রচলিত ক্যাটাগরির। এ ছোট দেশের জন্য এ পরম নেয়ামত। প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রফতানির অবারিত উজ্জ্বল সম্ভাবনা আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে কেবল। এতে খাদ্য অভাবের সাথে পুষ্টির অভাব দূর হবে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে কর্মসংস্থান হবে, দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও পরিবেশের উন্নয়ন হবে দেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। বিশ্ব বাহারি ফলের বাংলাকে চিনবে মানে ইজ্জতে সম্মানে যোগ্যতায়।

দেশে ফলের বাণিজ্যিক বাগান বাড়িয়ে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও নানাবিধ কারণে রফতানির পরিমাণে বছরভিত্তিক তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো ও হরটেক্স ফাউন্ডেশনের মতে ২০১৬ আমাদের রফতানিকৃত প্রধান ফলগুলো হলো–লেবুজাতীয় ফল, কলা, আম, কাঁঠাল, নারকেল, আমড়া, পেয়ারা, বেল, লিচু, কদবেল, কামরাঙ্গা, বরই, জলপাই, তেঁতুল। আর এসব ফল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, ভারত, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, সৌদিআরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, নিউজিল্যান্ডে রফতানি হয়। হিসাব মতে ফল রফতানি মান ধীরে ধীরে বাড়ছে গর্বের সাথে।

মনে রাখতে হবে খাদ্য অভ্যাসে এখনো শর্করার ওপর চাপ অনেক বেশি। এজন্য সুস্থ সবল জাতি গঠনে নিত্য দিনের খাদ্য তালিকায় শাকসবজি ফলমূলের সংশ্লিষ্টতার আরো অনেক বেশি বাড়ানো দরকার যৌক্তিকভাবে। এতে নিরাপদ খাদ্য দিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা যেমন সুনিশ্চিত হবে, তেমনি পুষ্টি নিশ্চিত হবে সুস্থ সবল মেধাবী দক্ষ সাহসী জাতি গঠনের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। একক খাদ্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ব্যালেন্স নির্ভরতা জাতিকে অনেকটুকু এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ফল কি শুধুই ফল? না না ফল খাদ্য পুষ্টি, পথ্য, ভেষজগুণের যোগানদার, বাণিজ্য বহুগুণের গর্বিত উৎস। কোন কোন ফল আবার সবজি হিসেবেও সমঝদার। ফল ও ফলগাছ খাদ্য কাঠ জ্বালানি, পশুখাদ্য, জৈবসার, ভূমি সংরক্ষণ, ঝড় ঝঞ্ঝায় প্রতিরোধক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ধন, পরিবেশ উন্নয়ন ও ভারসাম্য রক্ষা, পশুপাখির আশ্রয় ও খাবার সরবরাহ, জীবন আবশ্যকীয় উপাদান অক্সিজেন সরবরাহ, ছায়া দেয় মায়া দেয় সবই যোগান নিশ্চিত করে। এজন্য ফলভিত্তিক সুষ্ঠ সফল কার্যক্রম নতুন মাত্রা যোগ করে দেশের উন্নয়ন সমৃদ্ধিতে দীর্ঘ মেয়াদি বিশেষ অবদান রাখবে।

কাঁঠাল আম পেঁপে পেয়ারা লেবু কলা নিয়ে আমরা বিশেষভাবে ভাবতে পারি। কেননা এফলগুলো সহজেই সারা বছর বা বিশেষ সময়ে ফলে। ফলের প্রাপ্যতা নিয়েও আছে আমাদের ফলের বিশেষত্ব। কেননা বলতে গেলে ফল উৎপাদনে বিশেষ সময়ে কেন্দ্রীভূত আমাদের ফলের জাতসমূহ। ফল বিশেষজ্ঞদের মতে বছরের বৈশাখ-শ্রাবণ এ ৪ মাস আমাদের মোট উৎপাদিত ফলের ৫৬ শতাংশ পাওয়া যায় আর বছরের বাকি ৮ মাস অর্থাৎ ভাদ্র-চৈত্র মোট ফলের ৪৬ শতাংশ পাওয়া যায়।

ব্যাপারটিকে আরো বিশ্লেষণ করলে এভাবে আসে পৌষ মাসে ৫%, মাঘ ৫%, ফালগুন ৭% চৈত্রমাসে ৭% এ ৪ মাসে মোট ২৪%। বৈশাখ মাসে ১৩%, জ্যৈষ্ঠে ১৪%, আষাঢ়ে ১৭%, শ্রাবণে ১০% সহ মোট ৫৪%। আর শেষ ৪ মাসে ভাদ্র ৫%, আশ্বিন ৫%, কার্তিক ৬% এবং অগ্রহায়ণ মাসে ৬% সহ মোট ২২%। অর্থাৎ বছরের কিছু সময় অতিপ্রাপ্যতা এবং বেশি সময় প্রাপ্তির স্বল্পতা। কিন্তু এ কথাতো ঠিক যে, সব ফল না হোক বছরের এমন কোন মাস নেই যে যখন বাজারে কিছু না কিছু ফল পাওয়া যায়। কিন্তু একবারে ফলবিহীন কোন মাস নেই বাংলার বর্ষপঞ্জিতে বা ষড়ঋতুতে।

ভাবতে হবে ১ হেক্টর জমিতে ধান গম ভুট্টা আবাদের যতটুক লাভ হয় একই পরিমাণ জমিতে আম, কাঁঠাল, কলা, তরমুজ, পেঁপে আনারস উৎপাদন করে তার চেয়ে অনেক বেশি লাভবান হওয়া যায়। বর্তমানে বেশ কিছু ফলে পরিকল্পিত বাগান, ব্যবস্থাপনা, বিপণন অতি লাভজনক হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই এখনও বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিপণন পর্যায়ে কাঙ্খিত মাত্রায় এখনো পৌঁছা যাচ্ছে না এটা দুর্ভাগ্য আমাদের।

ফলভিত্তিক নানা রকমের আচার, মোরব্বা, জুস, জ্যাম, জেলি, চিপস, স্কোয়াশ, ক্যান্ডি, শুকনোফল, শিল্প, ওষুধ শিল্প গড়ে উঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। যা থেকে দেশিয় ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে যথেষ্ট অবদান রাখবে উল্লেখযোগ্য হারে।

ফল উৎপাদনে এখনও বিশেষ দৈন্যতা সমস্যা আছে আমাদের। এরমধ্যে আছে মানসম্মত চারা কলমের নার্সারির অভাব অপ্রতুলতা, সারা বছর ফলে এমন জাতের চারা কলমের অভাব, উৎপাদন উপকরণে অপ্রতুলতা দুস্প্রাপ্যতা দুর্মূল্য, সংশ্লিষ্টদের ব্যবহারিক জ্ঞান দক্ষতার অভাব, উচ্চ ফলনশীল জাতের অভাব, অঞ্চলভিত্তিক জাতের অপ্রতুলতা, মূলধন ঋণ সহযোগিতার অভাব, বালাই ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সমস্যা, গতানুগতিক চাষাবাদের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা, সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাতকরণের অসুবিধা, পরিবহন প্যাকেজিং, সংরক্ষণের সমস্যা, ফড়িয়া দালালি বিপণন বাজারজাতকরণের অসুবিধা, প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ধীরগতি, প্রয়োজনীয় প্রচার প্রচারণার অপ্রতুলতা, সংগ্রহ ও সংগ্রহ উত্তর প্রযুক্তির অভাব, বিশেষ গবেষণার অভাব এবং বিশেষ করে সার্বিক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার বিশেষ দুর্বলতা।

এতসব সমস্যার বেড়াজালে ফল আবাদ ব্যবস্থাপনা আটকে থাকলেও আছে আমাদের অবাধ সম্ভাবনাময় আশাব্যঞ্জক পথচলার আয়েসি সুযোগ। আমরা সহজেই সমবায়ভিত্তিক সমন্বিত ফল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারি। পাহাড়ি এবং অন্যান্য সম্ভাবনাময় এলাকাকে বিশেষ ফলজোন হিসেবে ঘোষণা করে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ফল উৎপাদনও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে, আদর্শ আধুনিক চারা কলমের নার্সারি স্থাপন করে সেখান থেকে যৌক্তিক মূল্যে বিক্রি বিতরণ, জাত প্রযুক্তি উদ্ভাবন আবিষ্কার করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশব্যাপী বিস্তার বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ দিয়ে জ্ঞান বাড়িয়ে প্রচার প্রচারণা জোরদার করে সার্বিকভাবে ফল সংশ্লিষ্টদের দক্ষ ও যোগ্য করে তুলতে পারি।

ঋণ বীমা মূলধন সুনিশ্চিত করে ফল উৎপাদন বিপণনকে আরো সম্প্রসারিতকরণ, সেচ বালাই ব্যবস্থাপনা, সংগ্রহ উত্তর প্যাকেজিং গ্রেডিং সংরক্ষণ, পরিবহন আধুনিক ব্যবস্থার প্রচলন ও জনপ্রিয়করণ, ছোট মাঝারি বড় শিল্প স্থাপনা, নতুন আমদানিকরা লাগসই সহজলভ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন, ফলভিত্তিক গবেষণা গুরুত্বের সাথে সম্প্রসারণ জোরদারকরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আবহাওয়া সচেতনতার অনুকূলে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ, ফল উৎপাদনে সু-কৃষি চর্চা, ফলব্যাগিং, প্রনিং শেয়ারিং, রিজুবিনেশন, ফেরোমন ফাঁদ, ব্যান্ডিং, অসময়ে ফল উৎপাদন কৌশল বাস্তবায়ন, বিদেশি আনা ফলের সুব্যবস্থাপনা, গরম পানির প্রক্রিয়াকরণ, অঞ্চলভিত্তিক জাত প্রযুক্তির বিস্তার, সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় আমাদের ফলভাণ্ডারকে দক্ষতার সাথে অনেক দূরের গর্বিত বাতিঘরে নিয়ে যেতে পারি।

দেশের প্রায় ২ কোটি বসতবাড়ির আওতাধীন প্রায় প্রায় ৫ লাখ হেক্টর জমি রয়েছে যা বাণিজ্যিক ফল চাষ নেটওয়ার্কের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নিরাপদ ফল উৎপাদনের বিশেষ জোন হিসেবে বসতবাড়ির ফলের আলাদা কদর বাড়াতে পারি। ভোক্তাই হচ্ছেন বিপণন রফতানি বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। ভোক্তার সন্তুষ্টিই পণ্যের চাহিদা বাড়িয়ে দেয় যার ভিত্তিতে আমদানি-রফতানি বাড়ে। ভোক্তার সন্তুষ্টির অনুকূলে কিছু বিবেচ্য মানদণ্ড রয়েছে যা সব দেশ বা সব ধরনের ফলের ক্ষেত্রেই কমবেশি প্রযোজ্য।

ফলের আকর্ষণীয় চেহারা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সুষম আকার, সংহতি, পরিপূর্ণ গঠন, সঠিক পরিপক্বতা, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রং, উজ্জ্বলতা, মিষ্টতা, সুঘ্রাণ, পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান, রোগজীবাণুমুক্ততা এসব সতর্কতার সাথে বিবেচনায় রাখতে হয়। ফল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যদি এসব গুণাবলী শতভাগ নিশ্চিত করা যায় এবং সাপ্লাই চেইন সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে ভোক্তা পর্যায়েও ফলের মান ভালো রাখা সম্ভব এবং সার্বিকভাবে বাজিমাত।

আমাদের খাদ্যোপানে শর্করা, আমিষ, চর্বি এসবের উৎস এবং প্রাপ্যতা বহুমুখী এবং হাতের নাগালে। কিন্তু খনিজ এবং ভিটামিনের জন্য ফলই আর শাকসবজি প্রথম এবং প্রধান উৎস। সতেজভাবে বলা যায় খনিজ আর ভিটামিন ফল থেকে পাওয়া খুব সহজ ও সরল। তা ছাড়া কাঁচা, পাকা সতেজ ফল খাওয়া ছাড়াও ফল ভালোভাবে সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাত করে সারা বছর খাওয়া যায়। অমৌসুমে রসনা তৃপ্তি মেটানো যায়। আমাদের রসনাযুক্ত বাহারি ফলের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে কৌশলে।

আধুনিক এবং প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, গবেষণা, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, পরিচর্যা, সেবা যত্নআত্তি দিয়ে দেশি ফল বেশি উৎপাদন করতে হবে। আমরা যখন আমাদের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে নান্দনিক উপায়ে দেশি ফল উৎপাদন করে বাজারজাত করতে পারব তখন বিদেশি ফলের বাজার এমনিতেই গুটিয়ে যাবে।

আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যবাহী ফলভান্ডারকে সুসমন্নত সুসমৃদ্ধ করে ফলভিত্তিক যত রকমের প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্ভব তা করে বিদেশে রফতানি করে অনেক দূরের সীমানায় পৌঁছে যাব। তখন গর্বের সাথে বলতে পারব ফলে পুষ্টি ফলে বল, ফল রফতানি করে বাড়াব দেশের মনোবল।

ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম
কৃষিবিদ ও লেখক
jagonews24.com ৩০ জুন ২০১৮

আমে ফরমালিন? চেনার উপায়

চলছে আমের ভরা মৌসুম। ছোটো বড় সব বয়সী মানুষের কাছেই এটি একটি জনপ্রিয় ফল। তবে ফরমালিন ও কীটনাশক মেশানোর কারণে এই সুস্বাদু ফলটিই মানুষ খেতে ভয় পান। তাই মন চাইলেও মানুষ ইচ্ছা মতো আম খাওয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখছেন। তবে একটু কৌশলী হলে বাজার থেকে কীটনাশক ও ফরমালিনবিহীন আম কিনা সম্ভব হতে পারে। এবার চলুন ফরমালিনমুক্ত আম চেনার উপায় জেনে নেওয়া যাক।

ফরমালিনমুক্ত আম : কীটনাশক এবং ফরমালিনমুক্ত আমে কাচাপাকা রং হয়। আমের গায়ে সাদাটে ভাব থাকবে; কালো কালো দাগও থাকবে। আমের বোটায় সুঘ্রাণ থাকবে। মুখে দিলে টক-মিষ্টি স্বাদ পাওয়া যাবে। আমে মাছি বসবে। আবার কিছু আম আছে যা পাকলেও রং সবুজই থাকে। এদের গায়ে কালো কালো দাগ থাকবে। সুঘ্রাণ থাকবে।

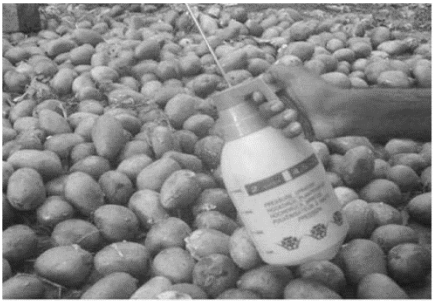

ফরমালিনযুক্ত আম : আমগুলো দেখতে সম্পূর্ণ হলুদ হবে। দেখতে খুব সুন্দর হবে। চকচকে দেখা যাবে। কোনো দাগ থাকবে না, মোলায়েম দেখাবে। কোনো ঘ্রাণ নেই বরং হালকা দুর্গন্ধ থাকবে। কোনো স্বাদ থাকবে না। আমের উপর কখনো মাছি বসে না।

অনলাইন ডেস্ক
bd.pratidin.com ১ জুলাই ২০১৮

বয়ঃসন্ধিতে কি করবে কিশোর কিশোরীরা?

এই বিশ্বে প্রতিটি মানুষের জীবন গৎবাঁধা এক ছকে আবদ্ধ। মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীর আলো-বাতাসের সান্নিধ্য লাভ, তারপর বেশ কয়েক বছর এই গ্রহে কাটিয়ে অজানার উদ্দেশ্য পাড়ি জমানো। মাঝের সময়টার জীবনকে যদি এক শব্দে বন্দি করতে হয় তবে শব্দটা বোধহয় পরিবর্তন। শৈশবের অনাবিল আনন্দের সময়টা পার করে কৈশোরে পা রাখার পর অন্যরকম এক অনুভূতির সঙ্গে পরিচয় হয় প্রত্যেক মানব সন্তানের। বাংলা ভাষায় শৈশব এবং তারুণ্যের সন্ধিস্থলে থাকা সময়টাকে বলা হয় বয়ঃসন্ধি। দেশীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এ সময়টায় অনিবার্য শারীরিক এবং মানসিক পরবর্তনের ফলে দিশেহারা ছেলেমেয়েদের সামগ্রিক অবস্থাকে উপজীব্য করেই আজকের লেখা সাজানো হয়েছে।

বয়ঃসন্ধিতে শারীরিক পরিবর্তন

শৈশব পেরিয়ে তারুণ্যে পা রাখার আগে প্রতিটি ছেলেমেয়ের দেহে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যা তাকে পরবর্তীতে প্রজননক্ষম পূর্ণাঙ্গ পুরুষ বা নারীতে পরিণত হতে সাহায্য করে। ছেলেদের ক্ষেত্রে সাধারণত ১২ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে পরিলক্ষিত হলেও মেয়েদের বেলায় পরিবর্তনের সময়কালটা কিছুটা আগে। সাধারণত ১১-১২ বছর বয়সে একজন মেয়ে তার দেহে পরিবর্তন লক্ষ করতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে তা ৮-৯ বছরেও দেখা দিতে পারে। অনেকের আবার কিছুটা দেরিতে যেমন ১৩ বছর বয়স থেকে শারীরিক পরিবর্তন আসে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় দেহে বিশেষ হরমোন নিঃসরণ শুরু হওয়ার ফলেই এই শারীরিক পরিবর্তন আসতে শুরু করে।

বয়ঃসন্ধিঃ মনের ঘরে অচেনা আগন্তুক

ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের দেহে ও মনে বয়ঃসন্ধিজনিত পরিবর্তনের প্রভাব বেশি। শৈশবের নির্ভেজাল সময় পেরিয়ে এসে হঠাৎ এই শারীরিক পরিবর্তন মোকাবেলার মানসিক শক্তি অর্জন করা অনেক মেয়ের জন্যই দুরুহ হয়ে পড়ে। এর সঙ্গে যদি যোগ হয় রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থা তবে তা যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। শারীরিক এই পরিবর্তন সম্পর্কে আগে থেকে পরিষ্কার কোনো ধারণা না থাকায় বয়ঃসন্ধির প্রথম দিকটায় এদেশের অধিকাংশ মেয়েদেরই বেশ বিব্রতকর সময় পার করতে হয়। শহরাঞ্চলে এই বিষয়টি নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও গ্রামীণ জনপদে অবস্থাটা এখনো শোচনীয়। অভিভাবকদের অনাগ্রহ, সঠিক শিক্ষা এবং তথ্যের অভাবে এসব অঞ্চলের মেয়েরা বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে প্রচন্ড মানসিক চাপের মধ্যে থাকে। এর সঙ্গে ঋতুস্রাবের মতো শারীরিক উপসর্গের কারণে অধিকাংশ কিশোরীর মনে অজানা ভয় কাজ করে। মনের মধ্যে নানা ভয় এবং প্রশ্নের উদ্রেকের ফলে কিশোরীর আত্মবিশ্বাসের পারদটা যে তলানিতে গিয়ে ঠেকে তা বলাই বাহুল্য।

এছাড়া এই সময়টায় ছেলে এবং মেয়ের উভয়েরই আচরণ এবং আবেগীয় পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। বয়ঃসন্ধি নিয়ে মনে নানা

সংকোচ এবং চিন্তাধারায় পরিবর্তনের কারণে নিয়মিত পরিবর্তিত আচরণ দেখা যায়। অনেক সময় অল্পতে রেগে যাওয়া কিংবা খিটখিটে মেজাজও লক্ষ করা যায়। এই সময়টায় ব্যক্তি নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করে বলে আত্মমর্যাদাবোধও বেড়ে যায়। এর ফলে অল্পতেই প্রতিক্রিয়া দেখানোটাও স্বাভাবিক আচরণে পরিণত হয়। এছাড়া অন্য কারো সাথে নিজের শারীরিক গঠনের তুলনা করে বা অন্যের আচরণ নকল করতে গিয়ে হতাশায় ডুবে যায় কিশোর মন। এই সময়টায় বন্ধু বা সঙ্গ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অসৎ সঙ্গের পাল্লায় পড়ে পর্নোগ্রাফি এবং ইভ টিজিংয়ের মতো বিকৃত কাজে লিপ্ত হয় অনেক কিশোর। মেয়েদের ক্ষেত্রে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতার কারণে আত্মবিধ্বংসী কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতাও দেখা যায়।

অভিভাবকদের করণীয়

বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে অভিভাবকদের সঙ্গে সন্তানের দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। অথচ এ সময়টায় অভিভাবকদের সঙ্গ সবচেয়ে বেশি দরকার। বিভিন্ন গবেষণা ও প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে এ সময়টায় অভিভাবকদের করণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সন্তানকে সময় দেওয়া

জন্মের পর থেকে শিশু প্রতিটি সমস্যার সমাধানে মা-বাবার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই শিশু বড় হয়ে কৈশোরে পদার্পণের পর শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে মা-বাবার সঙ্গে খোলা মনে আলোচনা করতে পারে না। ছোটবেলা থেকে মা-বাবার আঙুল ধরে চলা ছেলে বা মেয়েটির তখন কৈশোরের এ পরিবর্তন সামলানোর ক্ষমতা থাকে না। মেয়েদের ক্ষেত্রে শারীরিক ধকলটা বেশি যায় বলে অবস্থা আরো করুণ হয়ে পড়ে। এসব ব্যাপার বাবা-মায়ের সঙ্গে শেয়ার করা যাবে না এমন ধারণার ফলে অভিভাবকের সঙ্গে সন্তানের দূরত্ব বাড়তেই থাকে যা তাকে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে। তাই ছোটবেলা থেকেই অভিভাবকের উচিত সন্তানকে নিয়মিত সময় দেওয়া। ছোটবেলা থেকেই যদি বাবা-মা সন্তানের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশে একসঙ্গে সময় কাটান তবে বয়ঃসন্ধির সময়টায় এসে সন্তান সবকিছুই তাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেবে। তাই সন্তানের সঙ্গে একান্তে সময় কাটান এবং আগে থেকেই তাকে বয়ঃসন্ধি সময়ের আশু পরিবর্তন সম্পর্কে জানান।

সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক হোক সহজ

সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক হতে হবে সহজ এবং সাবলীল। এ সম্পর্কের গভীরতা এতটাই বেশি হওয়া উচিত যাতে সন্তান সবসময় তার মা-বাবার সঙ্গে যে কোনো বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারে। এভাবে সহজ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে সন্তানের উপযুক্ত শিক্ষা এবং মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করা যাবে। এর সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে জগতের নিয়মানুসারে বয়ঃসন্ধি বা যৌনজীবন সংক্রান্ত বিষয়গুলো অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং এসব নিয়ে আলোচনা করাটা অন্য আট-দশটি বিষয়ের মতোই স্বাভাবিক হওয়া উচিত। তাই সন্তানের সঙ্গে খোলামনে এসব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন। এর পাশাপাশি সন্তান যৌনবিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্য এবং উপযুক্ত শিক্ষা পাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধির সময়টায় শারীরিক পরিবর্তন এবং স্পর্শকাতর বিষয়গুলো সম্পর্কে মা আগে থেকেই সচেতন করে দিতে পারেন। এছাড়া আপনার মেয়ে কোনো যৌন-নিপীড়নের শিকার হচ্ছে কিনা তার দিকে খেয়াল রাখুন। মায়ের সঙ্গে এমন সম্পর্ক মেয়ের মনে সব সংকোচ এবং ভয় দূর করবে এবং একই সঙ্গে তাকে স্বাবলম্বী এবং যৌন সচেতন করে তুলবে।

অতিরিক্ত সমালোচনা না করা

সন্তানের ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়া কিংবা সমালোচনা করাটা মোটেই খারাপ কিছু নয়। তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে সমালোচনাটা যাতে মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। বয়ঃসন্ধির সময়টায় ছোটো-খাটো বিষয়ে অতিরিক্ত সমালোচনা করলে সন্তানের মনে তা বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় মা-বাবার বকুনির পরও সন্তান একই ভুল বারবার করছে। অথচ এই সন্তানই যখন ছোটো ছিল তখন মা-বাবার প্রতিটি কথা মেনে চলত। সন্তানের আচরণে এই পরিবর্তনে হতাশ হয়ে সমালোচনার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়াটা মোটেও উচিত নয়। এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে এই বয়সটায় এসে সন্তানের হঠাৎ জেদি হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ অবস্থায় সন্তানের ছোটো-খাটো ভুলগুলো মাফ করে দিয়ে বুঝিয়ে বলতে হবে।

অন্ধের মতো অনুকরণ বন্ধ করা

এখনকার সময়ে সন্তান লালন-পালনে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসান অনেক অভিভাবক। সন্তানকে নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা এবং পাশের বাড়ির অভিভাবকদের অনুকরণ বা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে গিয়ে নিজের সন্তানের প্রতি মনোযোগ দিতে ভুলে যান অনেক মা-বাবা। এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে সন্তানের উপযুক্ত যত্ন এবং শিক্ষার জন্য মা-বাবার কোনো বিকল্প নেই। আপনার সন্তানকে ঠিক কিভাবে বড় করে তুলতে হবে তা আপনার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। তাই অযথা পড়শীর ঘরে উঁকি না মেরে বা তথাকথিত বিশেষজ্ঞের পরামর্শের জন্য বসে না থেকে নিজের সন্তানের দিকে মনোযোগ দিন।

সন্তানের সঙ্গী নিয়ে সচেতন হোন

বয়ঃসন্ধির সময়টায় সন্তানের বন্ধুদের সম্পর্কে জানুন। অনেক সময় এই বয়সটায় অসৎ সঙ্গে পড়ে সন্তান ভুল পথে পরিচালিত হয়। তবে সন্তানের উপর এই নজরদারির মানে এই নয় যে তার মোবাইলের মেসেজ ঘেঁটে দেখতে হবে কিংবা প্রতিটি বিষয়ে জবাবদিহি চাইতে হবে। এর চেয়ে আগে থেকেই সন্তানকে বন্ধু নির্বাচনের ব্যাপারে সচেতন করুন। ছেলে বা মেয়ের বন্ধুদের বাসায় নিয়ে এসে তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলুন। এভাবে সন্তানের উপর নজরদারিও অক্ষুণ্ন থাকবে এবং একইসঙ্গে বিষয়টি নিয়ে সন্তানের মনে কোনো প্রশ্নই আসবে না।

জন্মের পর থেকে কতশত স্বপ্ন নিয়ে জীবন সমুদ্রে নৌকা ভাসাই আমরা। সেই স্বপ্ন অর্জনের জন্য জীবনের প্রতিটা ধাপে খুব সতর্কতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাই বয়ঃসন্ধির অস্থির সময়টার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত থাকা উচিত। কর্মজীবন শুরুর আগে এই সময়টা ভালোভাবে সুস্থ পরিবেশে কাটাতে পারলে জীবনের সেই স্বপ্নগুলোর বন্দরে একদিন না একদিন ঠিকই নোঙর ফেলা যাবে।

কালের কণ্ঠ ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

কৃষি অর্থনীতি পড়ে যে সব চাকরি

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি কৃষি। ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেই এখন আর কৃষি শিক্ষা-গবেষণা সীমাবদ্ধ নেই। কৃষি এখন বৈশ্বিক অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। ফলে দেশে ও বিদেশে কৃষির উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্র দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তৈরি হচ্ছে নতুন ধারণা, বাড়ছে কর্মক্ষেত্র। সম্ভাবনাময় এই ক্ষেত্রটিতে তাই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে গবেষক ও অর্থনীতিবিদের চাহিদা। দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রটি আগেই প্রতিষ্ঠিত থাকলেও কৃষি অর্থনীতি গবেষণার ধারণাটি সম্প্রতি ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তো বটেই, কৃষি অর্থনীতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও এ বিষয়ে পাঠদান করা হচ্ছে। এ বিষয়ে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রোকেয়া বেগম বলেন, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উন্নয়নে এ দেশে কৃষি অর্থনীতি গ্র্যাজুয়েটদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিসিএসসহ সরকারি ও বেসরকারি বহুজাতিক কোম্পানিতে কৃষি অর্থনীতিবিদদের চাহিদা দিনদিন আরও বৃদ্ধি পাবে।

চাকরির ক্ষেত্র

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন : বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের আওতাভুক্ত সরকারি সব প্রথম শ্রেণির চাকরিতে আবেদন করতে পারে।

কৃষি বিপণন অধিদফতর : কৃষি বিপণন অধিদফতরের অধীনে কৃষি অর্থনীতির বিশেষ (টেকনিক্যাল) ক্যাডার সার্ভিস চালু হয়েছে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বারি), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ব্রি), বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএলআরআই), বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএসআরআই), বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিনা), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিজেআরআই), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ইরি), আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা ইন্সটিটিউট, আন্তর্জাতিক ফসল গবেষণা ইন্সটিটিউট, মার্কিন শ্রম পরিসংখ্যান অধিদফতর, আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র ইত্যাদিতে কৃষি অর্থনীতির স্বতন্ত্র বিভাগ রয়েছে যেখানে কৃষি অর্থনীতি গ্র্যাজুয়েটদের নিয়োগ দেয়া হয়।

সায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান : সব সায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো), বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি), বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ইত্যাদিতে কৃষি অর্থনীতি গ্র্যাজুয়েটদের স্বতন্ত্র বিভাগে নিয়োগ দেয়া হয়।

ব্যাংক : কৃষি অর্থনীতি গ্র্যাজুয়েটরা সব সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে আবেদনের যোগ্যতা রাখে। বিশেষভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, মেঘনা ব্যাংক, মধুমতি ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক ইত্যাদিতে কৃষি অর্থনীতি গ্র্যাজুয়েটদের বিশেষ চাহিদা রয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এ কৃষি অর্থনীতি গ্র্যাজুয়েটদের আলাদা ভাবে নিয়োগ দেয়া হয়।

অন্যান্য কোম্পানি : প্রায় সব সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানিতে কৃষি অর্থনীতি গ্র্যাজুয়েটদের চাহিদা রয়েছে। বিশেষভাবে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লি., ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি., জিল বাংলা সুগার মিলস লি., পাবনা সুগার মিলস লি. ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিও : এশিয়া ফাউন্ডেশন, অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ, প্রাক্টিক্যাল অ্যাকশন, ইউএসএআইডি, আইএফএডি, ইউএসডিএ, ড্যানিডা, এফএও, আইডিই, কেয়ার, ব্র্যাক, ওয়ার্ল্ড ভিশন, সানেট, ডেভেক্স, আশা, প্রশিকা, ডিএফআইডি, ওয়ার্ল্ড ফিশ, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (ব্যাট), হরটেক্স ফাউন্ডেশন, কারিতাস, এসএফডিএফ, বিএমডিএ, জিআইজেড, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, এসকিউ গ্রুপ, মাহদিন গ্রুপ, এগ্রো ডাইভারসিটি কমপ্লেক্স ইত্যাদিতে কৃষি অর্থনীতি গ্র্যাজুয়েটদের বিশেষ চাহিদা রয়েছে।

কোথায় পড়বেন : শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

■ মাহসাব রনি
যুগান্তর ২১ অক্টোবর ২০১৬

সুন্দর করে কথা বলা শিখতে চাও ১০টি উপায়ে জেনে নাও

আমরা আমাদের জীবনে অনেক মানুষকে দেখেছি যারা অনেক জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ঠিক মতো প্রকাশ করতে পারে না। এমনকি শিক্ষা জীবনে এমন অনেক শিক্ষকদের দেখেছি যাঁদের পড়া আমরা কিছুই বুঝতাম না। নিঃসন্দেহে তারা অনেক জ্ঞানী কিন্তু ঘাটতি ছিল উপস্থাপনের।

সুন্দর করে কথা বলা হচ্ছে একটি আর্ট। স্মার্টনেসের প্রথম শর্ত এটি। অনেকেই দেখা যায় অনেক জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও উপস্থাপনের ঘাটতি থাকায় কেউ তাতে আগ্রহ দেখায় না। নিজেকে প্রকাশ করতে কে না চায়? সবাই চায় নিজেকে সবচেয়ে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে। বাহ্যিক সৌন্দর্যের মধ্যে ভাব প্রকাশের সৌন্দর্য হচ্ছে অন্যতম একটি উপাদান।

অনেকেই আছেন খুব ভালো মনের মানুষ, দেখতেও সুন্দর কিন্তু তিনি ভালো কথা বললেও যিনি শুনছেন তার ভালো লাগে না। শুধুমাত্র কীভাবে সুন্দর করে কথা বলতে হয় তা না জানার কারণে। এ কাজ খুব কঠিন কিছু নয়। নিজের চেষ্টা এবং সামান্য কিছু গাইডলাইনই যথেষ্ট। উপস্থাপন আরও চমকপ্রদ করতে আমরা আজকে দেখব সুন্দর করে কথা বলার কয়েকটি গাইডলাইন।

১। নিজেকে বিশ্লেষণ কর :

প্রথমেই নিজেকে বিশ্লেষণ করতে হবে। তুমি কী বিষয়ে কথা বলছ, কীভাবে কথাটি শুরু করছ, কার সঙ্গে কথা বলছ এবং তার সাথে দেখতে হবে তোমার কণ্ঠস্বরটি কেমন। সেটি কি খুব বেশি কর্কশ, খুব মিষ্টি নাকি স্বাভাবিক। যেই বিষয় নিয়ে তুমি কথা বলছ সেই বিষয়ে তোমার দক্ষতা কেমন এটি জানাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিশ্লেষণের ফলাফল কাগজে লিখে রাখাই ভালো। সুন্দর করে কথা বলা পুরোটাই চর্চার ওপর নির্ভরশীল।

২। আগে শোনার ওপর গুরুত্ব দাও :

কোন একটা আলোচনায় যোগ দিতে গেলে আগে শোন কে কী বলছে। হুট করে কোন মন্তব্য করা বোকামির কাজ। মূল বিষয়টি নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা কর। কেউ যদি অনেক সুন্দর করে উপস্থাপন করে তবে তাকে অনুসরণ করা যেতে পারে।

৩। সুস্পষ্ট মতামত প্রয়োগ কর :

কখনই এমন কোন কথা বলা উচিত নয় যেটিতে মানুষ খুব বিব্রতবোধ করে কিংবা বিষয়বস্তুর সঙ্গে একদমই খাপ খায় না। অন্যের কথার মাঝে কথা বলাটা অনেকেই পছন্দ করে না। তবে কথা যদি বলতেই হয় সেটি ভদ্রভাবে বললে সবাই তাতে সাড়া দেবে। যেমনঃ Excuse me বলে বক্তার কথার সাথে যা যোগ করতে চাচ্ছিলে কিংবা সেই বিষয়ে কোন ব্যক্তিগত মতামতও দেয়া যেতে পারে।

৪। আত্মবিশ্বাসের সাথে বলো :

যা বলবে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলবে। দ্বিধা নিয়ে কিছু বলা উচিৎ নয়। বক্তাকে দ্বিধান্বিত দেখলে শ্রোতারা বক্তার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। আর যা বলছ, সেই কথাটি বলার সময় আত্মবিশ্বাসের কারণটিও বলা যেতে পারে।

সুন্দরভাবে কথা বলা সাফল্যের অন্যতম রহস্য!

মানুষের সাথে সুন্দর ও মার্জিতভাবে কথা বললে যেকোনো কাজ কিন্তু অনেক সহজ হয়ে যায়!

কথা বলার এমন সব টিপস নিতে ঘুরে এসো এই প্লেলিস্টটি থেকে!

৫ । পরিবেশ পরিস্থিতির দিকে খেয়াল কর :

পরিবেশ পরিস্থিতি সবসময় এক থাকবে না। সেই পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে কথা বলতে হয়। একটি আলোচনার ক্ষেত্রেও পরিবেশ পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়। কখনো হাসির সময় আসে আবার কখনো কঠোর সময় আসে কিংবা অনেক সময় অনেক গম্ভীর পরিস্থিতি তৈরি হয়। সব পরস্থিতিতে সব কথা মানায় না। নির্দিষ্ট সময়পোযোগী মন্তব্য করাই ভালো ।

উচ্চারণ শুদ্ধ করলে কথা শুনতেও অনেক ভালো লাগে।

৬ । মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখো :

কথা বলার সময়, সবসময় মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। অনেক সময় কথা বলতে বলতে বক্তা মূল বিষয় থেকে সরে পড়ে। তখন শ্রোতারা খুব বিরক্তবোধ করে। কারণ তারা তাদের মূল্যবান সময় গল্পে নষ্ট করতে চান না। দরকার হলে লিখে রাখতে পারো যেটি নিয়ে কথা বলতে চাও। তাহলে বক্তব্যগুলো মূল বিষয়ের মধ্যেই চলে আসবে।

৭ । Gap দিয়ে কথা বলো :

কথা বলার সময় একটু gap দিয়ে কথা বললে শ্রোতাদের বুঝতে সুবিধা হয়। বেশি তাড়াতাড়ি কথা বলা খুব বাজে একটি অভ্যাস। এতে শ্রোতাদেরও বুঝতে কষ্ট হয়। Gap দিয়ে কথা বললে মূল বিষয়ের ওপর গুরুত্বও দেয়া যায়। অন্যদিকে ধীরগতিতে কথা বললে শ্রোতারা বিরক্তবোধ করে এবং শোনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। সুতরাং, মধ্যবর্তী একটি মাপ বেছে কথা বললে শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া যায়। কথা বলার সময় গুরুত্ব অনুযায়ী কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করা যেতে পারে।

৮ । চলিত ভাষায় কথা বলো :

যে ভাষা সবাই বুঝে সে ভাষায় কথা বলা উচিৎ। উচ্চারণ শুদ্ধ করলে কথা শুনতেও অনেক ভালো লাগে। সঠিক বাংলা উচ্চারণ করে তাক লাগিয়ে দেয়া যায়। খুব বেশি দরকার পড়লে উচ্চারণের ওপর কিছু কোর্স ও করা যেতে পারে।

সঠিকভাবে কোন ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করতে পারা ইংরেজিতে ভালো করার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

শিখে নাও উচ্চারণ!!

৯ । কোনো Source অনুসরণ করা যেতে পারে :

উচ্চারণ সুন্দর করতে কিংবা জ্ঞান আহরণে বিভিন্ন source অনুসরণ করা যেতে পারে। যেমনঃ খবর, সিনেমা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

১০ । বিভিন্ন রকম বই পড় :

জ্ঞান অর্জনে বইয়ের বিকল্প নেই। উচ্চারণ শুদ্ধ করতে বই এর কঠিন শব্দগুলো জোরে জোরে পড়ে অনুশীলন করা যেতে পারে ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সুন্দর করে কথা বলা পুরোটাই নিজের হাতে। নিজস্ব চেষ্টা এবং উপরের গাইডলাইনগুলো অনুসরণ করলে সুন্দর করে কথা বলা হবে নিজের হাতের মুঠোয়।

10minuteschool.com

৩ ডিসেম্বর ২০১৭

ইংরেজিতে দারুণ কাজে দেবে লেখার অনুশীলন

বিদেশি ভাষা হওয়ায় অনেকেরই ভীতির জায়গা ইংরেজি। বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় ইংরেজি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অধিক নম্বর পেতে ইংরেজি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনিভাবে লিখিত পরীক্ষায় ধস নামানোর ক্ষেত্রে এটি বড় ভূমিকা রাখে। বিগত বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের অধিকাংশ ইংরেজিতে খারাপ করেছেন বলে শোনা যায়। তাই লিখিত পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে কাঙ্ক্ষিত ক্যাডার পাওয়ার ক্ষেত্রে ইংরেজিতে ভালো করার বিকল্প নেই। নিয়মিত অনুশীলন করলে ইংরেজিতে ভালো করা সম্ভব। *লিখছেন ৩৬তম বিসিএসে অ্যাডমিন ক্যাডারে প্রথম ইসমাইল হোসেন।*

নম্বর বণ্টন

বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় সাধারণ এবং টেকনিক্যাল উভয় ক্যাডারের প্রার্থীদের ইংরেজিতে মোট বরাদ্দ ২০০ নম্বর। প্রথম পত্রে ১০০ এবং দ্বিতীয় পত্রে ১০০। প্রথম পত্রে একটি Unseen Passage থাকে। Passage-এর ওপর ভিত্তি করে ৩০ নম্বরের ১০টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকে। কিছু Grammatical প্রশ্ন থাকে। এতেও বরাদ্দ ৩০ নম্বর। ১টি Summary ও ১টি Letter থাকে। এ দুটোতে বরাদ্দ ২০ নম্বর করে। দ্বিতীয় পত্রে থাকে অনুবাদ ও Easy Writing. ২৫ নম্বরের বাংলা থেকে ইংরেজি (Translation) এবং ২৫ নম্বরের ইংরেজি থেকে বাংলা (Re-Translation) অনুবাদ থাকে। একটি রচনা থাকে, এতে বরাদ্দ ৫০ নম্বর।

নম্বর ভালো পাওয়ার ৩ শর্ত

ভালো নম্বর পেতে ৩টি কথা মাথায় রাখুন–

শুদ্ধ বাক্য : ইংরেজি বাক্য অবশ্যই শুদ্ধ হতে হবে। অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে কোনো Grammatical Error থাকবে না।

শুদ্ধ বানান : বাক্যের মধ্যে কোনো বানান ভুল থাকবে না। প্রতিটি শব্দ যেন নির্ভুল হয়।

জোর দিন ভোকাবুলারিতে : ইংরেজিতে ভালো করতে Vocabularyi ওপর দক্ষতা থাকা জরুরি। প্রতিদিন vocabulary অনুশীলন করতে হবে।

উপরিউক্ত ৩টি কথা মাথায় রেখে Simple Sentence-এ নিজের ভাষায় ইংরেজি লিখে যান। দায়িত্ব নিয়ে বলছি, অবশ্যই ভালো নম্বর আসবে।

ইংরেজি লিখুন প্রতিদিন

ইংরেজি লিখিত পরীক্ষায় মুখস্থ করে কমন পাওয়ার কোনো বিষয় নেই। প্রশ্নানুযায়ী লেখার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে লিখে আসতে হবে। ইংরেজিতে যার লেখার দক্ষতা যত ভালো, সে তত ভালো করবে। লেখার দক্ষতা অর্জনে যেকোনো বিষয়ের ওপর লেখার অনুশীলন করুন। প্রতিদিন অন্তত এক পৃষ্ঠা হলেও ইংরেজি লিখুন। লেখার অভ্যাস থাকলে সহজেই উত্তর করা যায়।

প্রস্তুতি ও লেখার কৌশল

Passage থেকে প্রশ্নের উত্তর লেখার আগে প্রশ্নগুলো ভালোভাবে পড়ে নিন। তারপর Passage টি পড়ুন। প্রশ্নের উত্তরগুলো নিজের ভাষায় Simple Sentence-এ লিখুন। Passage থেকে সরাসরি কোনো বাক্য লিখবেন না। ৩-৪টি বাক্যে উত্তর লিখুন। যেকোনো ভালো মানের সহায়ক বই থেকে প্রতিদিন অনুশীলন করতে পারেন। Passage কমন আসে না। তাই যেকোনো বিষয়ে লেখার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

Grammatical অংশে সাধরণত Meaning of Words, Interchange of Parts of Speech, Joining Sentence, Make Sentence, Punctuation, Passage Narration, Transformation of Sentence ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন থাকে। তবে প্রশ্নগুলো Passage থেকে করা হবে। টু দ্য পয়েন্টে উত্তর লিখতে হবে। ভালো মানের ইংরেজি Grammar বই থেকে নিয়মিত অনুশীলন করলে এ অংশে ভালো করা যাবে।

Summary লেখার ক্ষেত্রে Passageটির মূল কথা বুঝে নিজের ভাষায় লিখতে হবে। নিজের মতো করে সুন্দর শব্দ ও নির্ভুল বাক্যে ১০০ শব্দের মধ্যে Summary লিখলে বেশি নম্বর পাওয়া যাবে।

Letter To Editor লেখার ক্ষেত্রে নিয়ম খুব গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক নিয়মে লিখলে ভালো নম্বর পাওয়া যায়। প্রতিদিন ইংরেজি পত্রিকার Letter To Editor অংশ দেখতে পারেন অথবা বিভিন্ন টপিক নিয়ে লেখার চর্চা করতে পারেন।

Letter To Editor এবং Summary লেখার ক্ষেত্রে যেহেতু একই Passage-এর ওপর ভিত্তি করে লিখতে হয়, তাই লক্ষ রাখতে হবে, যাতে উভয় টপিকে একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। ভিন্ন ভিন্ন বাক্য লিখলে নম্বর ভালো আসবে।

অনুবাদ অনুশীলনে বেশি সময় দিন। ইংরেজিতে অনুবাদ ভালো নম্বর পেতে সহায়তা করে। প্রতিদিন যেকোনো একটি বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদকীয় এবং উপসম্পাদকীয় কলাম বুঝে বুঝে অনুবাদ করুন। ভুলগুলো খুঁজে বের করে শুধরে নিন। বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে বাক্য বড় হলে ২ বা ৩টি বাক্যে অনুবাদ করুন। ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ করার ক্ষেত্রে ভাবানুবাদ করুন।

ইংরেজি রচনা লেখার ক্ষেত্রে শুদ্ধ বাক্যে লিখুন। অশুদ্ধ বাক্যে বিশাল পরিধির রচনা না লিখে শুদ্ধ বাক্যে প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত দিয়ে ছোট পরিধির রচনা লেখাটা অধিক যৌক্তিক। প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও চিত্র দিন। ইংরেজি রচনার জন্য আলাদাভাবে প্রস্তুতি না নিয়ে বাংলা রচনা প্রস্তুতি নেওয়ার পাশাপাশি ইংরেজির জন্যও প্রস্তুতি নিতে পারেন। সমসাময়িক বিষয়াবলি, সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, উন্নয়ন প্রকল্প, জলবায়ু, তথ্যপ্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বাংলা ও ইংরেজিতে রচনা আসার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

ইংরেজি পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য প্রার্থীর শুদ্ধ ইংরেজি বাক্য তৈরির সক্ষমতা, সঠিক ও নির্ভুল শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা যাচাই। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে এই যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে সাফল্য আসবেই।

কালের কণ্ঠ ২১ মার্চ ২০১৮

ফাউন্ডেশন সংবাদ

অভিনন্দন!!

এমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান

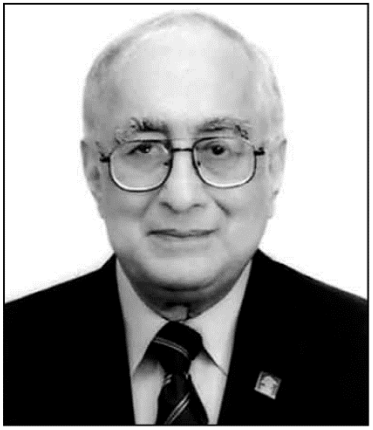

অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী

বাংলাদেশের শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখায় সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, এমেরিটাস অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর প্রাক্তন অধ্যাপক ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে পাঁচ বছরের জন্য জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছেন।

বরেণ্য এই তিন শিক্ষাবিদের মধ্যে অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান এবং অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্য। তাই তাদের এই বিশেষ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা অর্জনে আমরা ভীষণভাবে উচ্ছ্বসিত এবং একইসাথে গর্ব বোধ করছি।

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দেশবরেণ্য এ দুই শিক্ষাবিদকে জানাচ্ছি প্রাণঢালা অভিনন্দন!!

আমরা তাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

প্রকল্প সংবাদ

সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছেন যারা

মেধা লালন প্রকল্প'র প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, এবং অনেকে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করেছেন। ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে যারা সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করেছেন তাঁদের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো :

ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নং	ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নং
০১	আবুল হাসান মুহম্মদ বাশার (০১/১৯৮৫)	২৮	আহমেদ মেহেদী ইমাম (৫৩/১৯৮৭)
০২	মো. শাহ এমরান (০২/১৯৮৫)	২৯	মো. তাজুল ইসলাম (৫৬/১৯৮৭)
০৩	মো. আবু ছায়েদ (০৩/১৯৮৫)	৩০	আজিজুন্নেসা (৫৯/১৯৮৭)
০৪	মো. আবুল ইসলাম (০৪/১৯৮৫)	৩১	মাহবুবা সুলতানা (৬১/১৯৮৭)
০৫	মো. কালাম হোসেন চৌধুরী (০৬/১৯৮৫)	৩২	সৈয়দা জারকা জহির (৬৩/১৯৮৭)
০৬	এ. কে. এম. মেজবাহ উদ্দিন (০৮/১৯৮৫)	৩৩	আফরিন সুলতানা (৬৪/১৯৮৭)
০৭	জি. এম. আজিজুর রহমান (০৯/১৯৮৫)	৩৪	আফরোজা আক্তার (৬৫/১৯৮৮)
০৮	শাকিল ওয়াহেদ (১০/১৯৮৫)	৩৫	শামীম আরা বেগম (৬৭/১৯৮৮)
০৯	সারওয়াত চৌধুরী (১৫/১৯৮৫)	৩৬	মো. হেদায়েত উলাহ (৬৮/১৯৮৮)
১০	মো. আব্দুল খালেক (১৭/১৯৮৫)	৩৭	মো. মনিরুল ইসলাম (৭১/১৯৮৮)
১১	ধরিত্রী কুমার সরকার (১৮/১৯৮৫)	৩৮	দিলরুবা খানম (৭৫/১৯৮৮)
১২	সালেহ মো. মাসুদ (১৯/১৯৮৫)	৩৯	মো. ইকবাল আহমেদ মজুমদার (৭৬/১৯৮৮)
১৩	শেখ মু. রেফাত আলী (২১/১৯৮৫)	৪০	অসিত মজুমদার (৭৭/১৯৮৮)
১৪	মো. আব্দুল হালিম (২৩/১৯৮৬)	৪১	মো. মাহবুবুর রহমান (৭৯/১৯৮৮)
১৫	এফ. এম. ইসহাক আলী (২৬/১৯৮৬)	৪২	দেওয়ান মাউদুদুর রহমান (৮০/১৯৮৮)
১৬	ইমতিয়াজ আহমেদ মজুমদার (৩২/১৯৮৬)	৪৩	মুহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান (৮২/১৯৮৮)
১৭	মো. কামরুল আহসান (৩৩/১৯৮৬)	৪৪	মোছা. দিলরুবা শেলী ৮৩/১৯৮৮
১৮	তাপস কুমার কয়াল (৩৫/১৯৯৬)	৪৫	শায়লা ওয়াদুদ (৮৬/১৯৮৮)
১৯	শামসুন্নাহার (৩৬/১৯৮৬)	৪৬	ফারুক আহমেদ (৮৭/১৯৮৯)
২০	অহেদা হাশমত (৩৮/১৯৮৬)	৪৭	মো. শাহাদৎ হোসেন (৯১/১৯৮৯)
২১	শিরীন বানু (৩৯/১৯৮৬)	৪৮	শহীদুল ইসলাম (৯৫/১৯৮৯)
২২	আয়েশা খাতুন (৪০/১৯৮৬)	৪৯	মো. কামরুজ্জামান (৯৬/১৯৮৯)
২৩	মো. আব্দুল আজিজ (৪৩/১৯৮৬)	৫০	নুরুন্নাহার মিনা (৯৮/১৯৮৯)
২৪	এস. এম. আব্দুল করিম (৪৯/১৯৮৭)	৫১	তপন কুমার পাল (১০১/১৯৮৯)
২৫	মো. আব্দুল হামিদ (৫০/১৯৮৭)	৫২	মো. আতাউর রহমান (১০৩/১৯৮৯)
২৬	মো. জাহাঙ্গীর আলম (৫১/১৯৮৭)	৫৩	মো. তৌহিদ-উর-রহমান (১০৬/১৯৮৯)
২৭	মো. আমিনুল ইসলাম (৫২/১৯৮৭)	৫৪	খায়রুল আলম (১১০/১৯৯০)

ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নং	ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নং
৫৫	এ.বি.এম. খালেকুজ্জামান (১১৯/১৯৯০)	৯১	নুসরাত জাহান (২৪১/১৯৯৬)
৫৬	আমেনা বেগম মিমি (১২১/১৯৯০)	৯২	ফুয়াদ আশরাফুল আবেদীন (২৪৪/১৯৯৭)
৫৭	আজমিয়ারা পারভীন (১২৩/১৯৯০)	৯৩	দিলরুবা আক্তার (২৪৫/১৯৯৭)
৫৮	মোহাম্মদ একরাম উল্লাহ (১৩০/১৯৯০)	৯৪	মো. এশরামুজ্জামান (২৪৬/১৯৯৭)
৫৯	গুলনাহার বেগম (১৩৫/১৯৯১)	৯৫	মনিরা বেগম (২৪৯/১৯৯৭)
৬০	ইঞ্জি. মো. বসিরুজ্জামান মিয়া (১৪৬/১৯৯১)	৯৬	শ্যামলী রানী দে (২৫২/১৯৯৭)
৬১	প্রতিমা রানী কর্মকার (১৪১/১৯৯১)	৯৭	জান্নাতুল ফেরদৌস (২৫৩/১৯৯৭)
৬২	মো. জালাল আকবরী খান (১৪৩/৯১)	৯৮	মো. মোজাম্মেল হক (২৫৫/১৯৯৭)
৬৩	মোসা. মেহেরুন্নেছা (১৪৫/১৯৯১)	৯৯	মো. আসাদুল ইসলাম (২৫৬/১৯৯৭)
৬৪	মো. সাইদুর রহমান (১৫১/১৯৯১)	১০০	মো. আশিকুল ইসলাম (২৫৭/১৯৯৭)
৬৫	মোহাম্মদ আলী (১৫৪/১৯৯৩)	১০১	মো. সাইফুল ইসলাম (২৫৮/১৯৯৭)
৬৬	আবু হাশেম (১৫৮/১৯৯৩)	১০২	কান্তি ভূষণ মজুমদার (২৬০/১৯৯৭)
৬৭	মো. শফিকুল ইসলাম (১৬৩/১৯৯৩)	১০৩	মো. আলী আজম মিয়া (২৬১/১৯৯৭)
৬৮	মো. লিহাজ উদ্দিন (১৬৫/১৯৯৩)	১০৪	মো. মহিউদ্দিন (২৬২/১৯৯৭)
৬৯	সোহেল পারভেজ (১৬৯/১৯৯৩)	১০৫	মো. আব্দুল মোতালিব (২৬৩/১৯৯৭)
৭০	মো. আব্দুল ওয়াদুদ (১৭৩/১৯৯৩)	১০৬	সমীরন কান্তি নাথ (২৬৫/১৯৯৭)
৭১	মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (১৭৫/১৯৯৪)	১০৭	অলোক কুমার পাল (২৬৬/১৯৯৭)
৭২	মো. খোরশেদ আলম (১৭৭/১৯৯৪)	১০৮	মোঃ নাজমুল হক রাজু (২৬৭/১৯৯৭)
৭৩	মো. মনসুর আলী (১৭৯/১৯৯৪)	১০৯	ফারজানা তানজিন রুমা (২৬৮/১৯৯৭)
৭৪	মিন্টু বৈরাগী (১৮২/১৯৯৪)	১১০	মো. মাহতাবুল ইসলাম (২৭৫/১৯৯৮)
৭৫	তুষার কান্তি দাস (১৮৪/১৯৯৪)	১১১	মো. সাইফুল ইসলাম (২৭৯/১৯৯৮)
৭৬	জবা রানী দেবী (১৮৫/১৯৯৪)	১১২	এস. এম. মাহফুজুর রহমান (২৮৩/১৯৯৮)
৭৭	লাকি ফারহানা (১৮৬/১৯৯৪)	১১৩	মোছা. হীহার আফরোজ শাপলা (২৮৪/১৯৯৮)
৭৮	মো. সাফায়েত উলাহ (১৯৬/১৯৯৪)	১১৪	মো. হাসমত আলী (২৮৮/১৯৯৮)
৭৯	অমর কুমার বর (২০২/১৯৯৫)	১১৫	নিবেদিতা রায় (৩০০/১৯৯৮)
৮০	রাশেদ হাসান (২০৫/১৯৯৫	১১৬	মোহাম্মদ আবু সাঈদ আরফিন খাঁন (৩০৮/১৯৯৯)
৮১	শামসুন্নাহার সালমা (২১৬/১৯৯৫)	১১৭	মো. কুতুব উদ্দিন খান (৩০৯/১৯৯৯)
৮২	অসীম কুমার সরকার (২১৭/১৯৯৫)	১১৮	মো. রহিম মিয়া (৩১৭/১৯৯৯)
৮৩	এ. এম. জামাল হোসেন (২২৬/১৯৯৬)	১১৯	মো. কেরামত আলী (৩১৮/১৯৯৯)
৮৪	মোহাম্মদ মোজাহারুল ইসলাম (২২৮/১৯৯৬)	১২০	মো. এমরান হোসেন (৩১৯/১৯৯৯))
৮৫	মো. শরিফুল ইসলাম (২৩০/১৯৯৬)	১২১	সোহেল রানা (৩২১/১৯৯৯)
৮৬	মো. তরিকুল ইসলাম (২৩২/১৯৯৫	১২২	মো. তরিকুল ইসলাম (৩২৩/১৯৯৯)
৮৭	সানী খান মজলিস (২৩৫/১৯৯৬)	১২৩	এস. জি. এম. তারিক-বিন-আলী (৩২৭/১৯৯৯)
৮৮	ইলোরা নাহিদ (২৩৬/১৯৯৬)	১২৪	আবু সালেহ মো. কামরুজ্জামান (৩২৮/১৯৯৯)
৮৯	মোছা. সুলতানা রাজিয়া (২৩৯/১৯৯৬)	১২৫	মো. হারুন অর রশিদ (৩২৯/১৯৯৯)
৯০	মু. জামাল উদ্দীন (২৪০/১৯৯৬)	১২৬	মোছা. গায়লা পারভীন (৩৩৪/১৯৯৯)

ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নং	ক্রমিক নং	নাম ও সদস্য নং
১২৭	লায়লা আফিফা আজাদ (৩৪০/১৯৯৯)	১৫৮	শায়লা শারমীন রূপালী (৫২৫/২০০৩)
১২৮	আছিয়া আক্তার (৩৪১/১৯৯৯)	১৫৯	শামিমা আক্তার শাপলা (৫২৪/২০০৩)
১২৯	টুম্পা বড়ুয়া (৩৪৩/১৯৯৯)	১৬০	সুসমিতা কুন্ড (৫৩৪/২০০৩)
১৩০	তাছলিমা আক্তার (৩৪৭/১৯৯৯)	১৬১	ফাতেমা জেনী (৫৪১/২০০৩)
১৩১	ফারেহা শিরিন চৌধুরী (৩৫১/১৯৯৯)	১৬২	মো. মোস্তফা কামাল (৫৬২/২০০৩)
১৩২	মো. তফাজ্জাল হোসেন (৩৫৬/২০০০)	১৬৩	মিঠু চন্দ্র অধিকারী (৫৬৬/২০০৩)
১৩৩	এস. কে. এম. রাকিবুজ্জামান (৩৫৭/২০০০)	১৬৪	দিলীপ কুমার ত্রিপুরা (৫৭২/২০০৩)
১৩৪	মো. আবুল খায়ের (৩৬০/২০০০)	১৬৫	মো. আশরাফ সিদ্দিক (৫৭৫/২০০৩)
১৩৫	মো. রিদুয়ানুর রহমান (৩৬১/২০০০	১৬৬	মো. কামরুল হাসান (৫৭৭/২০০৩)
১৩৬	মো. হাসানুজ্জামান (৩৬৩/২০০০)	১৬৭	মো. শামীম কবীর সরকার (৫৭৮/২০০৩)
১৩৭	মো. আরমান উল্লাহ (৩৬৬/২০০০)	১৬৮	ফাহমিদা আক্তার (৫৮৯/২০০৪)
১৩৮	মো. জালাল উদ্দীন জায়গীরদার (৩৮৪/২০০০)	১৬৯	ফাতেমা যোহরা (৬০২/২০০৪)
১৩৯	মোহাম্মাদ (৩৯১/২০০০)	১৭০	উম্মে হানি (৬০৫/২০০৪)
১৪০	খাইরুল আলম (৩৯৪/২০০০)	১৭১	মোহাম্মদ নুরুল হাসান (৬১১/২০০৪)
১৪১	মোছা. খাদিজা পারভীন (৩৯৮/২০০০)	১৭২	ইঞ্জি. মো. রওশন আলী (৬১৯/২০০৪)
১৪২	মোছা. হূর-এ-জান্নাত (৪০৪/২০০০)	১৭৩	নূরী জাহান আরবী (৬৫৮/২০০৫ এসএসসি)
১৪৩	কাজী মাহমুদা আক্তার (৪০৬/২০০১)	১৭৪	নার্গিস সুলতানা (৭০৮/২০০৭ এসএসসি)
১৪৪	তানজিয়া আক্তার (৪১৩/২০০০)	১৭৫	মাকসুদা জাহান আঁখি (০১/২০০৫ এইচএসসি)
১৪৫	মো. আরাফাত হোসেন (৪২৩/২০০১)	১৭৬	মোহাম্মদ খুরশেদ আলম (০২/২০০৫ এইচএসসি)
১৪৬	মো. মোস্তফা মাহবুব রাসেল (৪২৬/২০০১)	১৭৭	কাউকাব আকতার (০৯/২০০৫ এইচএসসি)
১৪৭	সোহেলুর রহমান (৪৪১/২০০১)	১৭৮	ফারজানা ইসলাম খান (১১/২০০৫ এইচএসসি)
১৪৮	সুশোভন রায় শুভ্র (৪৫৩/২০০১)	১৭৯	আতাউর রহমান (১৯/২০০৫ এইচএসসি)
১৪৯	মোছা. মীর নুরানী রূপমা (৪৬৫/২০০১)	১৮০	মো. আমিরুল ইসলাম (২৩/২০০৫ এইচএসসি)
১৫০	মো. শাহজাহান কবীর (৪৮১/২০০২)	১৮১	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান আকন্দ (২৬/২০০৫ এইচএসসি)
১৫১	মো. মিজানুর রহমান (৪৮২/২০০২)	১৮২	নাদিরা মোকাররোমা (৩৪/২০০৬ এইচএসসি)
১৫২	সুকান্ত মন্ডল (৪৮৯/২০০২)	১৮৩	খালেদা ইয়াসমিন (৬৭/২০০৭ এইচএসসি)
১৫৩	জরহর বালা (৪৯২/২০০২)	১৮৪	ফারজানা ববি (৭৪৬/২০০৮)
১৫৪	রূপন কান্তি নাথ (৪৯৪/২০০২)	১৮৫	মো. সালাহউদ্দিন (৭৭০/২০০৮)
১৫৫	মোছা. ইাসরিন জাহান (৪৯৬/২০০২)	১৮৬	মো. রিদুয়ানুর রহমান (৩৬১/২০০০)
১৫৬	শাকিলা-বু-পাশা (৫০৫/২০০২)	১৮৭	সোহেলুর রহমান (৪৪১/২০০১)
১৫৭	মোছা. সেলিনা অক্তার (৫০৮/২০০২)		

আমরা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাদের এই দায়িত্বসচেতনতার পরিচয় প্রদানের ফলেই মেধালালন প্রকল্প'র কার্যক্রমের আওতায় আরও অধিকসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে ঋণ প্রদান সম্ভবপর হচ্ছে। নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যারা এখনো ঋণ ফেরত প্রদান শুরু করেননি, তাদের অতিসত্বর কিস্তিতে/এককালীন ঋণ ফেরত প্রদান করবার জন্য আন্তরিক অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

প্রকল্প সংবাদ

সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ প্রদানের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করে বিজ্ঞাপন প্রকাশ

প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও ফাউন্ডেশনের 'মেধা লালন প্রকল্প'-এর অধীনে সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ প্রদানের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড থেকে ২০১৮ সালে মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট ফর্মের মাধ্যমে দরখাস্ত আহবান করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনটি ১ জুন ২০১৮ (শুক্রবার) দৈনিক প্রথম আলো ও দৈনিক কালের কণ্ঠ, দৈনিক পূর্বাঞ্চল ও দৈনিক করতোয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া, ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট www.hdfbd.com থেকেও আবেদন ফর্মটি সংগ্রহ করার সুবিধা রাখা হয়েছে।

রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা

মেধা লালন প্রকল্প'র বর্তমান সদস্যদের পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিগত আয়োজনসমূহের ধারাবাহিকতায় এবারও (২০১৮) একটি রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বোর্ডের প্রয়াত সদস্য বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক ও শিশু সংগঠন 'কচি কাঁচার মেলা' এর প্রতিষ্ঠাতা রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই-এর স্মরণে এবারের প্রতিযোগিতার নামকরণ করা হয়েছে 'রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা'।

রচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে 'নৈতিকতা উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা'। নিজ হাতে বাংলায় দুই হাজার (২০০০) শব্দের মধ্যে A4 সাইজের সাদা কাগজে (কাগজের উভয় পিঠে লিখা গ্রহণযোগ্য নয়) রচনাটি লিখে ফাউন্ডেশনে পাঠাতে হবে। রচনার শেষে সদস্য'র নাম এবং সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে; অন্যথায় তা বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। রচনাটি অবশ্যই আগামী ৩০ আগস্ট, ২০১৮ তারিখের মধ্যে ফাউন্ডেশন অফিসে পৌছাতে হবে। রচনা মূল্যায়ন করার জন্য ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি রচনাসমূহের মান বিচার করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করবেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের জন্য নির্ধারিত পুরস্কার-মূল্য যথাক্রমে টা. ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা), টা. ৮,০০০/- (আট হাজার টাকা) এবং টাকা ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা)। সুবিধাজনক সময়ে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম তিনটি স্থান অর্জনকারীদের উক্ত পুরস্কার প্রদান করা হবে। এছাড়াও পুরস্কৃত রচনা তিনটি 'নবীন' পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করা হবে।

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ব্যাচ ২০১৩ (ছাত্র)

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১.	মো. স্বপ্ন সামিউল্লাহ ১০৫৭/২০১৩ গ্রাম: ভবানন্দপুর, ডাকঘর: নেকমরদ, থানা: রানীশংকৈল জেলা: ঠাকুরগাঁও।	মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, ৩য় বর্ষ বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম।
২.	মো. আমির হোসেন ১০৫৮/২০১৩ গ্রাম: মধ্যধুবনী, ডাকঘর: সিংগীমারী, থানা: হাতীবান্ধা জেলা: লালমনিরহাট।	ইংরেজি, ১ম বর্ষ হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
৩.	মো. সাইদার রহমান ১০৫৯/২০১৩ গ্রাম: পূর্ব রসুলপুর, ডাকঘর: মধ্যপাড়া, থানা: পার্বতীপুর জেলা: দিনাজপুর।	ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং, ২য় বর্ষ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
৪.	মো. বায়েজীদ হোসেন ১০৬০/২০১৩ গ্রাম: উত্তর পারুলিয়া, ডাকঘর: দক্ষিণ পারুলিয়া থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি, ২য় বর্ষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
৫.	শাহ আলম ১০৬১/২০১৩ গ্রাম: দেবীপুর, ডাকঘর: বাতিসা, থানা: চৌদ্দগ্রাম, জেলা: কুমিল্লা।	কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ২য় বর্ষ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ।
৬.	মো. মোরছালিন মিয়া ১০৬২/২০১৩ গ্রাম: জারুল্যাপুর, ডাকঘর: লালপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর জেলা: রংপুর।	বিএসসি ইন ফিসারিজ, ২য় বর্ষ হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
৭.	মো. পাভেল ইসলাম ১০৬৩/২০১৩ গ্রাম: দক্ষিণ কাকড়া, ডাকঘর: কাকড়া বাজার, থানা: ডিমলা জেলা: নীলফামারী।	এমবিবিএস, ২য় বর্ষ রংপুর মেডিকেল কলেজ।
৮.	বাদল চন্দ্র মজুমদার ১০৬৪/২০১৩ গ্রাম: উত্তর বেজুগালিয়া, ডাকঘর: তমরদ্দি, থানা: হাতিয়া জেলা: নোয়াখালী।	ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ১ম বর্ষ ইনস্টিটিউট অব সাইন্স ট্রেড এন্ড টেকনোলজি, ঢাকা।
৯.	মো. শামীম রেজা ১০৬৫/২০১৩ গ্রাম: লাহোর, ডাক: রায়গঞ্জ, ইউনিয়ন: ধানগড়া, থানা: রায়গঞ্জ জেলা: সিরাজগঞ্জ।	ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল, ২য় বর্ষ নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
১০.	মো. রায়হান বাবু ১০৬৬/২০১ গ্রাম: পশ্চিম বেজগ্রাম, ডাকঘর ও থানা: হাতিবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট	ইংরেজি, ২য় বর্ষ আলিমুদ্দিন ডিগ্রি কলেজ, হাতিবান্ধা।
১১.	মির্জা হাফিজ ১০৬৭/২০১৩ গ্রাম: পূর্ব বেজগ্রাম, ডাকঘর: নওদাবাস, থানা: হাতিবান্ধা জেলা: লালমনিরহাট।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ৩য় বর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১২.	মিরাজুল ইসলাম ১০৬৮/২০১৩ গ্রাম: পূর্বসিন্দুর্না, ডাক ও থানা: হাতিবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ৩য় বর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ব্যাচ ২০১৩ (ছাত্র)

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১৩.	চিন্ময় মল্লিক ১০৬৯/২০১৩ গ্রাম: গোড়কাঠি, ডাকঘর: চালনা বাজার, থানা: দাকোপ জেলা: খুলনা।	পুর: কৌশল ইঞ্জিনিয়ারিং, ২য় বর্ষ খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
১৪.	মো. রাশেদ উদ্দিন ১০৭১/২০১৩ গ্রাম ও ডাকঘর: মনোহরপুর, থানা: কচুয়া, জেলা: চাঁদপুর।	ইলেকট্রিকাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ২য় বর্ষ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
১৫.	মো. আব্দুল মান্নান খান ১০৭৩/২০১৩ গ্রাম: উত্তর বেজুগালিয়া, ডাকঘর: সাহেবানীরহাট থানা: হাতিয়া, জেলা: নোয়াখালী।	এমবিবিএস, ২য় বর্ষ রাগিব আলী মেডিকেল কলেজ, সিলেট।
১৬.	মো. আবদুর রহিম ১০৭৫/২০১৩ গ্রাম ও ডাকঘর: নয়াদিবাড়ি, থানা: গোমস্তাপুর জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	প্রাণীবিদ্যা, ২য় বর্ষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
১৭.	মো. নাসির উদ্দীন ১০৭৬/২০১৩ গ্রাম: লেবুজিলবুনিয়া, ডাকঘর: কলারদোয়ানিয়া, থানা: নাজিরপুর জেলা: পিরোজপুর।	বিবিএস, ২য় বর্ষ শহিদ স্মৃতি ডিগ্রি কলেজ, পিরোজপুর।
১৮.	মো. মেহেদী হাসান সজীব ১০৭৭/২০১৩ গ্রাম: শটিবাড়ী, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর।	বিএসসি (পাস) ১ম বর্ষ শঠিবাড়ি ডিগ্রি কলেজ, রংপুর।
১৯.	মো. মেহেদী হাসান ১০৭৮/২০১৩ গ্রাম ও ডাকঘর: নয়াদিয়াড়ী, থানা: গোমস্তাপুর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	লেদার প্রডাক্টাস ইঞ্জিনিয়ারিং, ৩য় বর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২০.	মঞ্জুরুল ইসলাম ১০৭৯/২০১৩ কাউন্সিলপাড়া, ৪নং টংভাঙ্গা, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	ইংরেজি, ২য় বর্ষ হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
২১.	ভিক্টর মন্ডল ১০৮০/২০১৩ গ্রাম: চুনকুড়ি, ডাকঘর: বাজুয়া, থানা: দাকোপ, জেলা: খুলনা।	মনোবিজ্ঞান, ২য় বর্ষ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।
২২.	মো. আরিফুজ্জামান ১০৮১/২০১৩ গ্রাম: উত্তর হলদীবাড়ী, ডাকঘর: সিন্দুনা, থানা: হাতীবান্ধা জেলা: লালমনিরহাট।	রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ২য় বর্ষ কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।
২৩.	শামীম আল মাহদী ১০৮২/২০১৩ গ্রাম: পশ্চিম বেজগ্রাম, ডাকঘর ও থানা : হাতীবান্ধা জেলা: লালমনিরহাট।	বিএসসি এজি, ২য় বর্ষ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
২৪.	মো. সুজন মিয়া ১০৮৩/২০১৩ গ্রাম: নিঝাল, ডাকঘর: রানীপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর।	পদার্থ বিজ্ঞান, ২য় বর্ষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
২৫.	মো. রাজিব মিয়া ১০৮৫/২০১৩ গ্রাম: আফজালপুর, ডাকঘর: রানীপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর জেলা: রংপুর।	পদার্থ বিজ্ঞান, ২য় বর্ষ রংপুর সরকারি কলেজ।

মাথায় কত প্রশ্ন আসে

কেনো আমরা স্বপ্ন দেখি?

পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যে কীনা স্বপ্ন দেখে না। সব মানুষই স্বপ্ন দেখে। আবার একেকজনের স্বপ্নের ধরনও একেকরকম।

তো কেনো আমরা স্বপ্ন দেখি? এটা খুবই কমন প্রশ্ন যে কেনো আমরা স্বপ্ন দেখি। কিন্তু এর উত্তরটা প্রশ্নের মতো এতটা সহজ নয়। কারণ স্বপ্ন নিয়ে গবেষণা এতটা সহজসাধ্য নয়। স্বপ্ন দেখার কারণ সম্বন্ধে কয়েকটি হাইপোথিসিস রয়েছে। যেমন: আমরা স্বপ্ন দেখি আমাদের অজানা ইচ্ছা ও চাওয়াগুলোকে জানার জন্য। আবার অনেকের মতে স্বপ্ন ঘুমের REM (Rapid Eye Movement) স্তরে মস্তিষ্কের অতি সক্রিয়তার কারণে হয়ে থাকে।

স্বপ্ন আমাদের অনেকের ভয়ের কারণ হয়েও দাঁড়ায়। কারণ আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে থাকি। তবে এই স্বপ্নের কারণে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও হয়েছে। পর্যায় সারণির মূল ভিত্তিটা এসেছে স্বপ্নের মাধ্যমে। পর্যায় সারণির উদ্ভাবক দিমিত্রি ইভানোভিচ মেন্ডেলিফ একদিন পর্যায় সারণি নিয়ে গবেষণা করতে করতে তার ডেস্কেই ঘুমিয়ে পড়েন। তখন তিনি স্বপ্নে মৌলগুলোর বিন্যাস কৌশল দেখতে পান।

ঘুম ভাঙার পর তিনি তা একটি কাগজে লিখে ফেলেন। এটারই সংশোধিত রূপ আজকের পর্যায় সারণি। এ সম্বন্ধে মেন্ডেলিফ বলেন, 'স্বপ্নে আমি দেখলাম একটা ছকে সবগুলো উপাদান জায়গামতো বসে যাচ্ছে এবং ঘুম ভাঙার সাথে সাথে একটি কাগজে আমি তা লিখে ফেলি'।

আবার বেনজিন চক্রও এসেছিল স্বপ্নের মাধ্যমে। ১৮৬৫ সালে বিজ্ঞানী অগাস্ট কালকুলেল গবেষণা করতে করতে তার চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্নে তিনি দেখতে পান একটি সাপ চক্রাকারে ঘুরছে ও নিজের লেজ খেয়ে ফেলছে। সাপটির গায়ে তিনি কার্বন ও হাইড্রোজেনের সঠিক অনুপাত দেখতে পান। ঘুম ভাঙার পর এ থেকেই তিনি বের করে ফেলেন বেনজিন চক্র।

বিখ্যাত গণিতবিদ রামানুজান আচার্য দাবি করেন তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে গণিতের নতুন নতুন সূত্র পেয়ে যেতেন। তিনি বলেন, 'ঘুমানোর সময় আমার অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা হয়। আমি দেখছিলাম রক্তে বয়ে যাওয়া লাল একটি পর্দা যাতে হঠাৎ করে একটি হাত এসে লেখতে শুরু করল। হাতটি উপবৃত্ত সম্পর্কিত কিছু যোগজও লিখল। জেগে উঠার পর যত দ্রুত সম্ভব আমি তা একটি কাগজে লিখে ফেললাম।'

এরকমভাবে আমরা স্বপ্নে অনেক সময় অনেক কিছু দেখে থাকি যা আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত। সেসব স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও হয়ে থাকতে পারে।

স্বপ্ন মানুষের কাছে সবসময়ই রহস্যময়। এ নিয়ে মানুষের জানার আগ্রহ সবসময়ই প্রকট ছিল। আগে প্রয়োজনীয় সুবিধার অভাবে স্বপ্ন নিয়ে গবেষণা তেমন একটা করা যায়নি। তবে বর্তমানে বিভিন্ন সুবিধার কারণে স্বপ্ন নিয়ে গবেষণা খুবই দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। আশা করা যায় খুব দ্রুতই আমরা স্বপ্নের রহস্য উদঘাটন করতে পারব।

বিএমআই (BMI) বা বডি মাস ইনডেক্স কি?

স্থূলতা ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, স্ট্রোকসহ নানা ঝুঁকি তৈরি করে। তাই কেউ স্থূলতার সমস্যায় ভুগছেন কিনা সেটি নির্ধারণ করতে বিশেষ এক ধরনের পরিমাপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় যেটি বিএমআই (BMI) বা বডি মাস ইনডেক্স নামে পরিচিত।

বি এম আই (BMI) নির্ণয়

কিলোগ্রামে নির্ণয় করা ওজনকে (ভর) মিটারে নির্ণয় করা উচ্চতার

বর্গ দিয়ে ভাগ করতে হবে। ওজন ও উচ্চতা যথাক্রমে পাউন্ড ও ইঞ্চিতে নির্ণয় করা হলে ৭০৩ দ্বারা গুণ করতে হবে।

$$\text{বিএমআই} = \frac{\text{কিলোগ্রামে নির্ণয় করা ওজন}}{(\text{মিটারে নির্ণয় করা উচ্চতা})^২} = \frac{\text{পাউন্ডে নির্ণয় করা ওজন}}{(\text{ইঞ্চিতে নির্ণয় করা উচ্চতা})^২} \times ৭০৩$$

বিএমআই সীমা :

- ১৮.৫ এর কম হলে: কম ওজন, এটি উদ্বেগজনক,
- ১৮.৫ থেকে ২৫ এর মধ্যে হলে: স্বাভাবিক,
- ২৫ থেকে ৩০ এর মধ্যে হলে: অতিরিক্ত ওজন,
- ৩০ থেকে ৪০ এর মধ্যে হলে: স্থূলকায়,
- ৪০ এর বেশি হলে: অতিরিক্ত স্থূল, অসুস্থতা বলা যায়।

মানুষের স্বাস্থ্য বা সুস্থতার নির্দেশক হিসেবে বিএমআই এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। তবে এর বিপক্ষেও অনেকে বলে থাকেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, কারো শরীরে মেদের বদলে পেশীর পরিমাণ বেশি থাকলে তাকে স্থূল বলা যায় না। কিন্তু তাদের বিএমআই নির্ণয় করলেও স্থূল বলেই মনে হবে। তাদের মতে কোমরের মাপ থেকে অনেক কিছু বুঝে নেয়া যায়।

বজ্রপাত কীভাবে হয়

প্রকৃতির সুন্দরতম আর ভয়াবহতম ঘটনাগুলোর একটি বজ্রপাত। বিদ্যুৎ চমকানোর সময় যে স্ফুলিঙ্গ আমরা দেখি তার তাপমাত্রা সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রার চেয়েও বেশি এবং এসময় সৃষ্ট শকওয়েভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বজ্রপাতের সময় বাতাসের মধ্য দিয়ে উচ্চমাত্রার তড়িৎ প্রবাহ বা তড়িৎ ক্ষরণের কারণে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়।

বিদ্যুৎ চমকায় পানিচক্রের কারণে

আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর প্রক্রিয়াটি শুরু হয় পানি চক্রের মাধ্যমে। সূর্যের উত্তাপে পানি বাষ্পীভূত হয়। তাপশক্তি পেয়ে পানির অণুগুলো গ্যাসের অণুর মত ওপরের দিকে উঠতে থাকে। বায়ুমণ্ডলের ওপরের দিক থাকা শীতল স্তরে গিয়ে পানির অণুগুলো তাপ হারিয়ে ঘনীভূত হওয়ার মাধ্যমে মেঘে পরিণত হয়। এই মেঘ আরও ঠান্ডা হয়ে তরলে পরিণত হয়। পৃথিবীর আকর্ষণে এই তরল পানি আবার বৃষ্টি হয়ে ভূমিতে ফিরে আসে। তবে বেশি ঠান্ডা আবহাওয়া বিরাজ করলে পানির বাষ্প ঘন হয়ে তুষার কিংবা শিলায় পরিণত হয়।

মেঘ যেভাবে চার্জগ্রস্ত হয়

পানিচক্রের এই প্রক্রিয়াতে মেঘ চার্জগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মেঘের ওপরের অংশ ধনাত্মক চার্জগ্রস্ত হয় আর নিচের অংশ ঋণাত্মক চার্জগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মেঘ কেন চার্জগ্রস্ত হয় তা নিয়ে মতভেদ আছে। একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে জলীয়বাষ্প ওপরের দিকে ওঠার সময় মেঘের নিচের অংশের সাথে সৃষ্ট ঘর্ষণে ওপরের দিকে উঠতে থাকা জলীয়বাষ্প কণা থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই ইলেকট্রনগুলো মেঘের নিচের অংশে জমা হয় আর ইলেকট্রন হারিয়ে ধনাত্মক চার্জগ্রস্ত হয়ে পড়া বাষ্প ওপরের দিকে উঠে যায়। ফলে মেঘের নিচের অংশ ঋণাত্মক চার্জগ্রস্ত হয় আর ওপরের অংশ ধনাত্মক চার্জগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় মেঘের নিচের অংশ এতটাই ঋণাত্মক চার্জগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে তা ভূপৃষ্ঠের ইলেকট্রনগুলোকেও বিকর্ষণ করে গভীরে পাঠিয়ে দেয়। ফলে ভূপৃষ্ঠের ওপরের অংশ ধনাত্মক চার্জগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ভূপৃষ্ঠ আর মেঘের মধ্যে বিভব পার্থক্য সাংঘাতিক মাত্রায় হলে এটি নিজে থেকেই বাতাসকে আয়নিত করে বিদ্যুৎ প্রবাহের পথ করে নেয় যাকে বজ্রপাত বলা হয়। তবে বজ্রপাত কেবল মেঘ থেকে ভূমিতে হয় না, মেঘ থেকে মেঘেও হয়।

বজ্রপাতের প্রচণ্ড উত্তাপে বাতাসের যে হঠাৎ প্রসারণ হয় তার ফলেই বজ্রপাতের শব্দ তৈরি হয়। শব্দের বেগ আলোর বেগের চেয়ে কম বলে বজ্রপাতের শব্দ কিছুটা পরে শুনতে পাওয়া যায়।

হাইপোথিসিস কি?

বিজ্ঞানের নানা আলোচনায় সূত্র, তত্ত্ব, হাইপোথিসিস বা প্রকল্পের কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। অনেকসময় এদের একই মনে হলেও আসলে তা নয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম ধাপ হচ্ছে হাইপোথিসিস, অনেকে একে শিতি লোকের অনুমানও বলে থাকেন। তবে এর সাথে জড়িয়ে থাকে পর্যবেক্ষণ এবং অতীতে অর্জিত জ্ঞান। কোন ঘটনা নজরে আসার পর সেটির একটি ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন হয়। আর তখনই হাইপোথিসিসের জন্ম। এরপর পর্যবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে হাইপোথিসিসের সত্যতা যাচাই করা হয়।

ছবি : শিরোনামহীন | মাধ্যম : অ্যাক্রেলিক অন ক্যানভাস | শিল্পী : রিফাত আরা মীম

ছবি : মেঘালয় | মাধ্যম : জলরং | শিল্পী : রাজীব আহসান

নবীন

ষোড়শ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০১৮

সম্পাদক তাসনিম হাসান হাই কর্তৃক হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড
প্লট নং-২৩/৬, ব্লক-বি, বীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭ এর পক্ষে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ : যাযাবর মিন্টু। মুদ্রণ : পালক ০১৭১১৮৩৪০১৭। গ্রাফিক ডিজাইন : মমিন হোসেন